ঢাকাই গল্প

অবিনাশ সাহা

পরিবেশক
ভারতী লাইব্রেরী
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৫

প্রকাশক
আর. সাহা
প্রকাশ মহল
২২২, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু

মুদ্রাকর
শ্রীমুরারিমোহন কুমার
শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১৪

পাকিস্তানের পরিবেশক
নওরোজ কিতাবিস্তান
৪৬, বাংলা বাজার, ঢাকা

দাম ২·০০

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
প্রিয়বরেষু

গল্প বলার আগের কথা

ঢাকাই গল্প নিছক গল্পই—খোশ গল্প। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি-মানস এর সঙ্গে জড়িয়ে নেই। সুতরাং কোন ব্যক্তি বিশেষের মান-অপমানের প্রশ্নই ওঠে না।

অপবাদ আছে, 'বাঙালী শুধু কাঁদতেই জানে, হাসতে জানে না।' একদা এ মতবাদ যিনি বাঙালীর মাথায় চাপিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই তাঁর উপযুক্ত কৈফিয়ত দেবেন। কিন্তু আমরা বলবো, বাঙালী শুধু কাঁদতেই জানে না, হাসতেও জানে। তার মুখের হাসি আজও সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে হাটে-বাজারে—ক্ষেতে-খামারে—কলে-কারখানায়।

বাঙালীর মাথার ওপর দিয়ে একাধিক মন্বন্তর গেছে—মহামারী, প্লাবন, দাঙ্গা। সর্বশেষ দেশ বিভাগ। কিন্তু তাতেই কি বাঙালীর মুখের হাসি শুকিয়ে গেছে ?

সেদিনও তো বাঙালীকে দেখলাম তার মুখের জবান কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্রে প্রাণ দিতে। হাসতে হাসতে কারাবরণ করতে—বুলেটের সামনে বীরদর্পে দাঁড়াতে। কিন্তু তবু এ অপবাদ কেন ? একি শুধু পরিহাস না আর কিছু ?

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় একদা সম্রাট জাহাঙ্গীর 'জাহাঙ্গীর নগর'-এর পত্তন করেছিলেন। আবার ইতিহাসের বিবর্তনেই প্রাচীন সে জাহাঙ্গীর নগর আজকের ঢাকায় রূপান্তরিত। আমার ঢাকাই গল্পের মাল-মসলা এই ঢাকাকে কেন্দ্র ক'রেই সংগৃহীত হয়েছে।

রাজধানী ঢাকা বিরাট বিশাল। মেঘনা, পদ্মা, যমুনা বিধৌত তার সাংস্কৃতিক মানও বিরাট। ঢাকাই শাড়ী, ঢাকাই গহনা, ঢাকাই অমৃতি এর সব কিছুর মধ্যেই ধরা পড়ে তার বৈশিষ্ট্যের ছাপ। ঢাকার মসলিন তো জগতের এক পরম বিস্ময়। আবার নাচ গান কারু-কর্মেও তার বিরাট কীর্তি। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতিতেও আছে গৌরবময় ঐতিহ্য। বিরাট বিশাল ঢাকা। কিন্তু এই বিশাল ঢাকার মধ্যে আবার একটি ছোট্ট ঢাকাও আছে। সেটি হলো শহরঢাকা। এই শহর ঢাকার আবার একটি নিজস্ব মুখের

ভাষা আছে। সে ভাষা অমার্জিত হতে পারে কিন্তু নিঃসন্দেহে তা রস-সমৃদ্ধ। আমার মনে হয় রসিক মাত্রই সে স্বীকৃতি দেবেন। শহরঢাকা ছাড়া গ্রাম ঢাকার আর কোথাও এর পাত্তা মিলবে না। ঢাকাই গল্পের গোড়ার দিকের কয়েকটি গল্প এই শহর ঢাকাকে কেন্দ্র ক'রেই রচিত হয়েছে। বাকীগুলো বিরাট বিশাল গ্রাম ঢাকাকে কেন্দ্র ক'রে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা একটু খেয়াল ক'রে পড়লেই পার্থক্য ধরতে পারবেন। ইতি—

লেখক

আলপাকার কোট

বোশেখ মাস। বাড়িতে বিয়ের ধুম লেগেছে। হাট-বাজারের অন্ত নেই। বিরাট ফর্দ নিয়ে নকুলচন্দ্র ঢাকা ছোটে। হাতে সময় খুবই কম। আজই বাজার নিয়ে ফিরে আসা চাই।

বেলা এগারোটা। সূর্য যেন আগুন ছড়াচ্ছে। মাথার ওপর ধান রাখলে ফুটে খই হয়। নকুলচন্দ্রের ওষ্ঠাগত প্রাণ। একে থলথলে বিরাট দেহ—তার ওপর আবার ঘটি-ঘটি জল খাওয়া। ভুঁড়ি নয় তো, তেল-ভর্তি খুদে জালাই একটা পেটের ওপর ঝুলছে যেন। সব চেয়ে বিপদে ফেলেছে নকুলচন্দ্রকে কালো কুচকুচে লোমগুলো। অবিরত হুল ফোটাচ্ছে যেন গায়ে।

মেল ট্রেনে এসে নামে নকুলচন্দ্র। প্ল্যাটফরম লোকজনে গমগম করছে। কুলি, ফেরিওয়ালা, পানিওয়ালার দৌড়োদৌড়ির বিরাম নেই। সব চেয়ে ঘোড়-গাড়ির গাড়োয়ানরাই আছে ভাল। ওত পেতে এক-একটি খেঁকশেয়ালই যেন শিকার ধরতে ব্যস্ত। যাত্রীদের কেউ একজন পাদানীতে পা বাড়িয়েছে কি ছুটে গিয়ে ছেঁকে ধরছে। অবশ্য যাত্রীরা তাতে কেউ বেজার হচ্ছে না। আদর আপ্যায়নে খুশীর হাসিই খেলে কারো কারো ঠোঁটের কোণে। কেউ ডাকে, আইয়েন বড় মিঞা। কেউ বা মহারাজের বদলে মাহারাজ সম্বোধন ক'রেই আর একজনকে খুশী করতে চায়। আর একজন হয়তো জিজ্ঞেস করে, কোন্ হানে যাইবেন—দিগ্‌বাজার? উঠেন না বি, এ্যাক্ মিনিটে পোঁছাইয়া দেই। রফটের চাক্কা (রবারের চাকা) মালুম বি পাইবেন না···

নকুলচন্দ্র কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে ব্যস্তভাবেই প্ল্যাটফরমে নামে। হাতে গোটা কয়েক রেশন ব্যাগ ও ছোট একটা এটাচি কেস। যাবে নবাবপুর হয়ে চক বাজার। জায়গায় জায়গায় নেমে হাট-বাজার

করতে হবে। অবশ্য খালি হাত-পা থাকলে এক্ষুণি গাড়ি-ঘোড়ার দরকার ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিরুপায়—ট্যাঁকের কড়ি গণ্ডা কতক গচ্চা দিতেই হবে। সব দিক ভেবে-চিন্তে একখানা গাড়ি নিতেই মনস্থির করে নকুলচন্দ্র। তবে শহরে ও নতুন নয়। ঢাকার গাড়োয়ানদের বিলক্ষণ জানা আছে। মুখে ওরা যাই বলুক, স্বচক্ষে না দেখে কিছুতেই গাড়িতে উঠছে না।

গাড়োয়ান মাত্রেই কোন না কোন যাত্রীর পেছু নিয়েছে। কিন্তু নকুলচন্দ্রকে ছেঁকে ধরেছে একযোগে চার-পাঁচ জন। ওর আঙুল ভর্তি সোনার আংটিগুলোই হয়তো সকলকে বেশী ক'রে আকৃষ্ট করছে। হাতের বিছে কবচ-জোড়ার জৌলুসও কম নয়। সূর্যকিরণে নবগ্রহের নয়টি রত্ন জ্বল-জ্বল করছে। অসহ্য গরমে মটকার পাঞ্জাবিটা অনেকক্ষণ গা থেকে খুলে কাঁধের ওপর ফেলেছে নকুলচন্দ্র। পুরনো হলেও ওটার একটা আলাদা আভিজাত্য আছে। ওরা হয়তো সকলেই ওকে জমিদার আর নয়তো তালুকদার ঠাউরিয়েছে। তা যে যা ভাবে ভাবুক। ও কা'কেও কিছু বলবে না। বিদেশ-বিভুঁইয়ে একটু খাতির-যত্ন পেলে ক্ষতি কি।···কারো কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে খুশীর আমেজেই সকলের সঙ্গে প্ল্যাটফরমের বাইরে চলে আসে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে সারবন্দী গাড়িগুলোকে। না, বরাত আজ ওসমান গাড়োয়ানেরই ভাল। নকুলচন্দ্র অন্য কারো কথায় কান না দিয়ে ওসমানকেই ভাড়ার কথা জিজ্ঞেস করে।

ওসমান তো মহাখুশী। খোদা মেহেরবান। যাক, দু'দিন পরে আজ তাহলে একজন খানদানী সোয়ারীই পাওয়া গেলো। ভাড়ার কথা তাই সোজাসুজি না বলে রেওয়াজ মতো বিনয়ে ফেটে পড়ে, আপনাগ চরণের ধুলা ঝাইড়া বি খাই মাহারাজ, আপনাগ লগে আবার দর-ভাও করন লাগব নাকি? ওঠেন না, মোন যা চায় দিয়েন।

ওসমান বিনয়ে যতই গলে পড়ুক না নকুলচন্দ্র ওতে ভোলে না। সরাসরিই আবার বলে, না না মিঞা, ওসব মোন চাওয়া-চাওয়ির কাম নাই। যা নিবা সোজা কও।

আরও বার কয়েক বিনয় প্রকাশের পর সোজা কথায় ভাড়া নগদ পাঁচ সিকে ঠিক হলেও ওসমানের আবদার শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়। সাইদের সময় ওঠেন ত বি গাড়িতে! এক দিনের কাম নাকি। খুশী অইলে বি আর কিচু দিয়েন ঘোড়ারে খাইবার।

না না, আর কিচু পাইবা না। যাইবা ত তড়াতড়ি নও এলা, নকুলচন্দ্র দৃঢ় থেকেই বক্তব্য পেশ করে।

ঘোড়া জুড়তে জুড়তে ওসমান একটু অভিমান মিশ্রিত কণ্ঠেই জবাব দেয়, ইডা কি কইলেন মাহারাজ, যামু না? অন্যায় বি কিচু কইলে পায়ের থনে জোতা (জুতো) খুইলা মারেন না।

জবাবে নকুলচন্দ্র মুখে কিছু না বলে হাসতে হাসতেই গাড়িতে এসে ওঠে। ওসমান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষে নবাবপুরের পথ ধরে।

দেখতে দেখতে গাড়ি নবাবপুরে এসে পড়ে। বাঁ ফুটের মোড়ের ঐ সাদা বাড়িটাতেই মুল্‌জী সিক্কার আপিস। ফর্দে এক নম্বর মোহিনী বিড়ি দু'বাণ্ডিল রয়েছে। আড়তদার অপেক্ষা খোদ আপিস থেকে নেওয়াই শ্রেয়। খাঁটি আর তাজা জিনিস পাওয়া যাবে। নকুলচন্দ্র জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে যথাস্থানে গাড়ি বাঁধতে বলে।

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ওসমান লাগাম কষে দাঁড় করায় গাড়ি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, শুভকাজের বাজার করতে এসে গোড়াতেই ধোঁয়া কেনা চলে না। হিসেব মতো পাঁচ আনার সিদ্ধিই আগে কিনতে হয়। সিদ্ধিতে সিদ্ধি লাভ। না, কষ্ট যা-ই কেন হোক না, শাস্ত্রীয় বিধি অবহেলা করা চলবে না। সিদ্ধির দোকান অবশ্য গলির শেষ সীমান্তে। গাড়ি অত ভেতরে যাবে না। গরমে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। তা হোক, তবু গাফিলতি ক'রে অমঙ্গল ঘটানো চলবে না। কত আদরের পাঁচী। অতটুকু থেকে এত বড়টা হয়েছে। বলতে গেলে যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছে। না না, বিধিমতোই কাজ হোক। নকুলচন্দ্র গাড়ি থেকে নেমে সোজা সিদ্ধির খোঁজেই রওনা হয়। গরমে রাস্তায় পিচ গলে কাই হয়ে আছে। পা পড়তেই সমস্ত শরীরটা ঝংকার দিয়ে ওঠে। হয়তো ফোসকাই ফুটবে

পায়ের তলায়। কিন্তু কি আর করা যাবে? হাঁপাতে হাঁপাতে সিদ্ধি পাঁচ আনার কিনে কোনরকমে মুল্‌জী সিক্কার আপিসে এসে ঢোকে। থপ ক'রে বসে পড়ে হেলান দেওয়া বড় বেঞ্চটার ওপরে। ভাগ্যগুণে সেলস্‌ম্যানের নজরে পড়তেও দেরি হয় না। ভদ্রলোক প্রথমেই কোন কাজ-কারবারের কথা না জিজ্ঞেস ক'রে বিড়ি আর দেশলাই এগিয়ে দেয়। আদর-আপ্যায়নে নকুলচন্দ্র আশাতীত খুশী হয়। ওর বোধ হয় একটা বিড়ির তেষ্টাই পেয়েছিল। কোঁচার খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে একটা বিড়ি ধরিয়ে খানিক দম নিতে থাকে।

সেলস্‌ম্যানও তার প্রাথমিক কর্তব্য শেষ ক'রে অন্য দিকে মন দেয়। না, নকুলচন্দ্র এখন অনেকটা সুস্থ। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করাই এখন বিধেয়। হাতের পোড়া বিড়িটা যথাস্থানে নিক্ষেপ ক'রে নিজের আর্জি পেশ করে।

সেলস্‌ম্যান মনোযোগ দিয়েই ওর কথাগুলো শোনে এবং কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ না ক'রে বেশ ভদ্রভাবেই জবাব দেয়, পাঁচ হাজারের কমে তো এখানে বিক্রি নেই, বাবু সাহেব! আপনি এজেন্টের কাছ থেকে নেবেন।

নকুলচন্দ্রের উত্তপ্ত দেহ খানিকটা শীতল হয়ে এসেছিল, মুহূর্তে আবার গরম হয়ে ওঠে। বলে কি বেটা! পাঁচ হাজারের কমে বিক্রি নেই! হাটে-বাজারে দোকানদার যে এক পয়সার বিড়িও উপযাচক হয়ে বেচে থাকে। গৃহস্থর পক্ষে একসঙ্গে এক হাজার বিড়ি কেনা কি কম হলো! কোথাকার লাট-বেলাট এসেছে বেটারা?…নকুলচন্দ্র কাছা ঝেড়ে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়ে। কাজ নেই পয়সা দিয়ে জিনিস কিনতে এসে লোকের পায়ে তেল মাখাবার। ট্যাঁকে কড়ি থাকলে বিড়ির অভাব হবে না।…তেতেপুড়ে আপিসে ঢুকেছিল তেতেপুড়েই বেরিয়ে আসতে উদ্যত হয়।

সেলস্‌ম্যান ওর হাবভাব বুঝে কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু নকুলচন্দ্র সে সুযোগ দেয় না। মুখের ওপরেই কড়া ক'রে শুনিয়ে

দেয়, কাম নাই মশয় আপনার ঢলাইনা কথা শুনবার। পয়সা থাকলে বিড়ি অনেক পামুনে।—রাগে গজগজ করতে করতেই আপিস থেকে নেমে এসে গাড়িতে উঠতে যায়।

ওসমান কোচবাক্সের ওপর বসে সবই লক্ষ্য করছিল। সহানুভূতির সঙ্গেই জিজ্ঞেস করে, কি অইল মাহারাজ, বিড়ি বি আনলেন না?

আনুম কোনহান থনে? হালারা (শালারা) যে মাথার কিরা দিয়া বইচে, পাঁচ হাজারের কম বেচব না!—সক্রোধেই উত্তর করে নকুলচন্দ্র।

মনে মনে হাসি পেলেও ওসমান সমতা রেখেই সান্ত্বনা দেয়, কিয়ের বি গেচিলেন হালা ভাইটাগ (ভাটিয়া) কাচে! অগ বিড়ি অগ থনে কম দামেই পাইবেন নে বি চকে।

নকুলচন্দ্র বলে, হ, তাই নও। পাঁচ হাজারের কমে যে বেচব না হ্যা কতা হালারা সাইন বোর্ডে লেইকা থুইলেই ত পারে।

ওসমান ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালাতে চালাতে বলে, বুচচেন না ক্যান, মাইনষেরে পেরাসিনে করাই হালাগ কাম।

নকুলচন্দ্র আর কথা বাড়ায় না। একটা সীটে বসে আর একটা সীটের ওপর পা তুলে দিয়ে কিঞ্চিৎ আরাম করতে থাকে।

ওসমানের প্রাণেও বোধ হয় সহসা খুশীর হাওয়া লাগে। চড়া রোদেও প্রাণ খুলে গান ধরে, আমি বন ফুল গো···

নকুলচন্দ্রের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। শুভকাজের সওদা করতে এসে প্রথমেই বাধা পেলো। শালা ভাটিয়ার কাছে না গেলেই ছিল ভাল। মনটা অবিরতই খুঁত-খুঁত করতে থাকে।

গাড়ি বড় জোর হাত পঞ্চাশেক এগিয়েছে আবার দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চেঁচাতে থাকে, আরে রাখ রাখ, ঐ বড় কাপড়ের দোকানটার সামনে লাগাও।

ওসমান গান থামিয়ে চলতি ঘোড়ার মুখে লাগাম কষে গাড়ির গতি রোধ করে। নকুলচন্দ্রের নির্দেশ মতো শাহী ষ্টোর্সের সামনে নিয়েই গাড়ি দাঁড় করায়।

নকুলচন্দ্র মাতা ঢাকেশ্বরীর উদ্দেশে বার কয়েক কপালে হাত ঠুকে ধীরে-সুস্থেই গাড়ি থেকে নামে। দোকানের সেলস্‌ম্যান মুহূর্তে ছুটে আসে গাড়ির কাছে। সবিনয়ে স্বাগত সম্ভাষণ জানায়। পান সিগারেট যোগে আপ্যায়নেও ত্রুটি হয় না।

নকুলচন্দ্র প্রথমে ভাবে, সিগারেট খাবে না। কে জানে, এখানেও সওদা হবে কি না। জাঁকজমক তো এদের আরও বেশী। কি বলতে কি বলবে তার ঠিক কি!—একটা পান মুখে দিলেও সিগারেট ধরাতে দ্বিধা বোধ করে। কিন্তু না, এরা রীতিমতো ভদ্রলোক। চাইলে আধ গজ কাপড়ও এরা কেটে বিক্রি করতে রাজী। শালা ভাটিয়াদের মতো অত ফুটুনি নেই। কথায় কথায় মনের খুশীতেই একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলে। উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে কাঁপড়ের জমি পরীক্ষা ক'রে নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়েই একখানা বেনারসী শাড়ী গস্ত করে। বড় পছন্দসই শাড়ী পাওয়া গেছে। এ রং পাঁচীকে মানাবে ভাল। কুটুমের কাছেও খাতির পাওয়া যাবে। খুশীতে গদ্‌গদ হয়েই শাড়ীর বাক্সটা বগলে ফেলে গাড়িতে এসে ওঠে নকুলচন্দ্র। আর-একটা সিগারেট হাতে ক'রে এনেছিল। গাড়ি ছাড়লে ধরিয়ে মৌজ করতে থাকে।

গাড়ি বাংলা বাজারের পথে চলেছে। হয়তো পঞ্চাশ গজও হবে না, নকুলচন্দ্র আবার চেঁচাতে শুরু করে।

ওসমান চলতি ঘোড়ার মুখে আবার লাগাম কষে মাঝ রাস্তাতেই গাড়ি দাঁড় করায়। বিরক্তির সঙ্গেই জিজ্ঞেস করে, কিছু ফালাইয়া আইলেন নাকি, মাহারাজ?

আরে না মিঞা, কিছু ফালাইয়া আহি নাই। শাড়ীর ই রং চলব না। মনেই আচিল না শুভকাজে আসমানী রং চলব না। তড়াতড়ি গাড়ি ঘোরাও, হাতের সিগারেট রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে অস্থির হয়ে ওঠে নকুলচন্দ্র।

মুখে চুমু খাওয়ার মতো আওয়াজ তুলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ি

ঘোরাতে বাধ্য হয় ওসমান। ইচ্ছে করে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে দেয় গেঁয়ো ভূতটাকে। কিন্তু পারে না।

শাড়ীর রংটা এখনো ঠিক অপছন্দ নয় নকুলচন্দ্রের। কিন্তু হলে কি হবে; পাঁচীর মা যে মুখে ঝাঁটা মারবে। পইপই ক'রে বেচারা লাল শাড়ীর কথা বলে দিয়েছে। কেন যে এ রংটা তখন পছন্দ হলো! শালা ভাটিয়াই মেজাজটা বিগড়ে দিয়েছে।···গাড়ি ঘোরাতে কিঞ্চিৎ দেরি হচ্ছিল ওসমানের—নকুলচন্দ্র ফেটে পড়ে, আরে এই মিঞা, কদ্দিন গাড়ি চালাইচ? এতক্ষণ লাগে গাড়ি ঘুরাইতে?

কি যে কন্ মাহারাজ! ঘোড়ার বি তো আর কলের জান না যে বুতাম টিপুম আর ঘুরব! একটু সবুর করেন।—এই হালা ঘোড়ার পো, মাহারাজ বি রাগ করবার নৈচে, হোনচ না? লাগামে টান দিয়ে কষে এক চাবুকের ঘা মারে।

দেখতে দেখতে গাড়ি আবার শাহী ষ্টোর্সের দরজায় এসে লাগে। সেলস্‌ম্যানও আবার এসে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু নকুলচন্দ্র হাসতে পারে না। শুকনো মুখেই শাড়ীর বাক্সটা হাতে ক'রে গাড়ি থেকে নামে। খানিক ইতস্তত ক'রে সঙ্কোচের সঙ্গেই আবদার জানায়, এই শাড়ীটা দয়া কইরা একটু বদলাইয়া দেওয়ন লাগব।

সেলস্‌ম্যান নয়তো যেন রসের ভিয়েন। আহ্লাদে ডগমগ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা বিনয় প্রকাশ করে, আরে হ্যার লেইগা এত দিক করবার নৈচেন ক্যান। আপনাগ দোকান, একবার ছাইড়া দশ বার বি বদলাইয়া নেন না।

উত্তর শুনে নকুলচন্দ্রের গোমড়া মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিনা দ্বিধায় আবার একটা সিগারেট ধরায়। হাসতে হাসতেই বলে, এই শাড়ীই, ইডার বদলে একটা লাল রঙের দ্যান।

ইস্, এই ত বি ঠেকাইলেন মাহারাজ। ইয়ার জুড়ি ত লাল রঙের বি অইব না। কিছু বাড়ন লাগব। তবে জমিন বিও জাদা সরস অইব। নকুলচন্দ্রের আবদারে সেলস্‌ম্যান উত্তর করে।

উত্তর শুনে নকুলচন্দ্র মাথায় হাত দিয়ে বসে। বলছে কি

বেটা! পঞ্চাশ টাকাতেই ত চক্ষু ছানাবড়া! আবার আরও বাড়ন লাগব!...কিন্তু কি আর করা যায়, চাইলে তো আর দাম ফেরত পাওয়া যাবে না। অগত্যা দেখতেই হবে।...অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘাড় কাত ক'রে সম্মতি জানায় নকুলচন্দ্র।

অরে, এক লম্বর বানারসীর বাক্সডা লইয়া আয়, নকুলচন্দ্রের সম্মতিতে খুশী হয়ে যোগানদারের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে সেলস্ম্যান।

চোখের পলক পড়তে না পড়তে বাক্স এনে হাজির করে যোগানদার। সেলস্ম্যান বাক্সের ডালা খুলে উচ্ছ্বাস জানায়, ল্যান মাহারাজ, এক লম্বর বানারসী। পাকা রং সাচ্চা জরি।

গোটা বাক্সের মধ্যে মাত্র একখানাই লাল রঙের শাড়ী আছে। নকুলচন্দ্র শাড়ীখানা টেনে নিয়ে ভাঁজের মধ্যে হাত গলিয়ে জমি পরীক্ষা করতে থাকে।

সেলস্ম্যান সুযোগ বুঝে আবার উচ্ছ্বাস জানায়, ইয়ার আর জমিন পরখ করন লাগব না, মাহারাজ। ইচ্ছা করলে জল বি বাইন্দা আনবার পারবেন। রং জরির জেল্লায় কয়নার (কনে) বি রোশনাই বাড়ব জামাই বি খুশী অইব। চক্ষু বইজা লইয়া যান।

জামাই খুশী হবে কি না পরের কথা। কিন্তু নকুলচন্দ্র নিজেই খুশী হতে পারে না। বিচার ক'রে দেখলে আগের শাড়ীখানাই ঢের ভাল। বেটা বাগে পেয়ে খারাপ জিনিসকেই ভাল বলে চালাতে চাচ্ছে। যত শালা চোট্টার কারবার! সেলস্ম্যানের উচ্ছ্বাসের কোন জবাব না দিয়ে মনে মনেই ইতস্তত করতে থাকে নকুলচন্দ্র।

সেলস্ম্যান অবস্থা বুঝে আবার উসকাতে থাকে, তামাম ঢাকা শহর ঘুরলে ইরকম শাড়ী মিলব না, মাহারাজ! দেখছেন না লাটের মদ্দে এই একটাই বি খালি লাল শাড়ী।

কথা শুনে নকুলচন্দ্রের ইচ্ছে হয় পাল্টা মোটা কথা শুনিয়ে দেয়! কিন্তু পারে না। দায় যখন ওর নিজের তখন মুখ বুজে সব শুনতেই হবে। মনের ভাব মনেই চাপা দিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গেই মন্তব্য করে, আগের শাড়ীখানাই আমার মনে ধরচে। ইখানা—

মুখের কথা শেষ করতে পারে না নকুলচন্দ্র। সেলস্‌ম্যান দু'চোখ বিস্ফারিত ক'রে প্রতিবাদ করে, আইজ্ঞা, আপনে কন কি মাহারাজ! রৈদ্রে রৈদ্রে ঘুইরা আপনার বি চক্ষের ঠিক নাই। ইডা অইল এক লম্বর আসল চিজ। এর লগে আপনে ঝুটা মালের জানপচান করবার চান?

নকুলচন্দ্র এবার ফুঁসে উঠতেই যাচ্ছিল, কোনরকমে আত্মসংবরণ করে। সবিনয়েই শুধোয়, আইচ্ছা কন, কত দেওয়ন লাগব?

না না, দামের কথা আর আপনেরে কেমনে কই! চিজ বি-ই যখন আপনার পছন্দ হয় নাই,—কৃত্রিম ক্ষোভের সঙ্গেই উত্তর করে সেলস্‌ম্যান। বলতে বলতে আবার একটা সিগারেট আর দেশলাই এগিয়ে দেয়।

হাজার হলেও নকুলচন্দ্র লোভ সংবরণ করতে পারে না।

সিগারেটটা ধরিয়ে আবার শুধোয়, সময় নাই, তড়াতড়ি কন, কি দেওয়ন লাগব?

না না, আমি কিচু কইবার চাই না। ইনসাব কইরা আপনেই বি যা দিবার দ্যান।

আরে ধুত্‌তর, খালি খালি কতা বাড়ান! আপনার জিনিস আপনে না কইলে নিবার পারুম নাকি?

আইচ্ছা, বনীর (বউনি) সময়ে দর-ভাওয়ের বি কাম নাই। আর দউশগা (দশটা) টেকা দ্যান।

হাতের সিগারেটটায় জোরে একটা টান দিয়েছিল নকুলচন্দ্র, উত্তর শুনে মনে হয় ঘুরে পড়ে যাবে। শালা কুট্টি বলে কি! কোথায় দশ টাকা কম হবে তা না আর দশ টাকা বেশী! না, বাজার করতে আসাই আজ ভুল হয়েছে।...হাতের সিগারেট হাতেই থাকে, নকুলচন্দ্র আর নকুলচন্দ্রের ভেতরে নেই।

সেলস্‌ম্যান সমতা রেখেই যোগানদারের উদ্দেশে বলে, অই রে এইডা বাক্সের মদ্দে ভাল কইরা বাইন্দা দে।

নকুলচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারে না। তাড়াতাড়ি

বাধা দেয়, না, এত দরে নিবার পারুম না। ঐ সমান সমান করেন।

আপনে কন কি! তাইলে বি কিছু দেওয়ন লাগব না। আগের টেকাও ফেরত লিয়া যান শাড়ী বি-ও এমনেই লিয়া যান।

মন্তব্য শুনে নকুলচন্দ্র মনে মনে ভাবে, সে ত তোমরা কতই দেবে চোট্টার দল। মুখেই কেবল লপচপানি!···প্রত্যুত্তরে বলে, অমনি নিমু কন কি! পাঁচ টেকা কম করেন।

বনীর সময় দর-ভাও করবেন না। দিবার হয় দশ টেকাই বি ছান নয়ত অমনিই বি লইয়া যান।

বেলা অনেক হয়ে গেছে। নকুলচন্দ্র বোঝে আর কথা বাড়ালে অনর্থক অপদস্থই হতে হবে। চোট্টারা একটা কানাকড়িও মাপ করবে না। তাই আর কথা না বাড়িয়ে দশ টাকার একখানা নোট ছুঁড়ে দিয়েই মন্তব্য করে, নেন্ আপনার মোন যা চায়।

সেলস্‌ম্যান বোধ হয় এবার বিবেকে ঘা খায়। হাসতে হাসতেই একটা টাকা ফেরত দিয়ে মন্তব্য করে, নেন্ কি আর করুম। আপনে যখন অসন্তুষ্ট হন। কিনা (কেনা) দামেই বি দিলাম।

নকুলচন্দ্র হুঁ হাঁ কিছু না বলে মুখ ভার ক'রেই শাড়ীর বাক্সটা হাতে ক'রে গাড়িতে এসে ওঠে। মনে মনে গালাগালি দেয়, নে শালারা তগ ঘাটের কড়ি। আর কোন দিন যদি এ-মুখো হই···

মুখ বুজেই চলতে চায় নকুলচন্দ্র, কিন্তু ওসমান ছাড়ে না। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়, কি অইল মাহারাজ, শাড়ী বি বদলাইলেন?

হ্যা, খোঁজে তোমার কি কাম মিঞা? সেলস্‌ম্যানের সঙ্গে না পেরে ওসমানের ওপরেই ফেটে পড়ে নকুলচন্দ্র।

কিন্তু ওসমান দমে না। আপন ঢঙে পুনরায় ভেংচি কাটে, না, এমনেই জিগাই আর কি। আপনার মুখখান বি ত শুকাইয়া বলদের পাচার মতন দেখাইবার নৈচে—

এই মিঞা, মুখ সামলাইয়া কতা কও, নকুলচন্দ্র তেড়ে ওঠে।

চটেন ক্যান মাহারাজ, রৈদ্রে কি আর মাথার বি কিছু ঠিক আচে ? কোনহানে যামু কন ?

নকুলচন্দ্র গলার স্বর গম্ভীর ক'রে বলে, বাংলা বাজার লও।

গাড়ি ঘুঙুরের আওয়াজ তুলে বাংলা বাজারের দিকেই ছুটতে থাকে। ওসমান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষে আবার গান ধরে, আমি বন ফুল গো—

গাড়ির ভেতরে নকুলচন্দ্রের অবস্থা শোচনীয়। শাড়ীর বাক্সটা খুলে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। ইস শালা বদমাস, গালে থাপ্পড় মেরে টাকাগুলো কেড়ে নিলে। পাঁচীর মা এখন এ শাড়ী টান মেরে ফেলে না দিলে হয়—

গাড়ি বাংলা বাজারের সীমানা প্রায় ছাড়িয়ে চলে। কিন্তু নকুলচন্দ্রের কোন সাড়া-শব্দ নেই। বেগতিক দেখে ওসমান সহসা ঘোড়ার মুখে লাগাম কষে শ্লেষের সঙ্গে প্রশ্ন করে, বাংলা বাজার বি ত ছাড়াই চললেন মাহারাজ, যাইবেন কোনহানে ?

ওসমানের তাড়ায় সহসা যেন সংবিৎ ফিরে পায় নকুলচন্দ্র। তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে রাখ রাখ মিঞা! আগে কইবার পার নাই। চন্দ্রা প্রেসে লও।

হ্যা ত বি ফালাইয়া আইলাম মশয়, ওসমানের কণ্ঠে বিরক্তির সুর।

তার আমি কি করুম ? ঐহানেই যাওয়ন লাগব।

হ, আপনে ত বি কইয়াই খালাস! আমার পেরাসিনিডা ক্যারা ছাহে ?

আরে নও নও মিঞা, কতা বাড়াইয় না, এতক্ষণ চইলা যাইবার পারতা।

ইস, হাওয়াই জাহাজে উঠচেন নাকি, মাহারাজ ?

বেকায়দায় পড়ে নকুলচন্দ্র আর হুঁ হাঁ করে না।

ওসমান গজগজ করতে করতেই গাড়ি ঘুরাতে থাকে। যথারীতি চন্দ্রা প্রেসের ফটকে এনে দাঁড় করায়।

নকুলচন্দ্র আর বিন্দুমাত্র দেরি করে না। তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে একটা কাগজ বার ক'রে প্রেসের ভেতরে ছোটে।

না, সব বেটাই দেখছি সমান। কতবার দু'টাকা দিয়ে প্রোগ্রাম ছাপিয়ে নিয়ে গেছি। আজ বেটা কিছুতেই তিন টাকার কমে রাজী নয়। তাও আবার ডাকে পাঠাবার খরচা আলাদা দিতে হবে। ঢাকার কুট্টি আর কাকে বলে! সুযোগ পেলেই পকেট ফাঁক করবে। পাঁচীর কপালে যে কি আছে ভগবানই জানেন! বিরক্ত হয়ে অগ্রিম জমা দিয়ে উঠে পড়ে।

ওসমান আবার হাঁকাতে হাঁকাতে নির্দেশ মতো বাবুর বাজারের পুলের মুখে এনে গাড়ি দাঁড় করায়।

সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। এখনো ঢের সওদা বাকী। ব্যস্তসমস্ত হয়েই নকুলচন্দ্র গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিল, ওসমান বাধা দেয়। কোচবাক্স থেকে লাফ দিয়ে নেমে আবদার জোড়ে, ঘোড়ায় বি জল খাইব মাহারাজ, কিচু ছাড়েন।

নকুলচন্দ্রের মেজাজটা স্বভাবতঃই ভাল নেই। ওসমানের আবদারে ফুঁসে ওঠে, কিছু ছাড়ুম মানে?

কইলাম ত মশয়, ঘোড়ায় বি জল খাইব, ওসমানের কণ্ঠেও কর্কশতা খান-খান হয়ে ঝরে পড়ে।

নকুলচন্দ্র কিছুটা সামলিয়ে নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে, কি জানি মিঞা, কোন দিন ত কিছু দেই নাই!

খ্যান নাই এহন বি খ্যান। ডর নাই, ভোগা দিয়া কিচু নিমু না। মাইনষেরে জিগাইলেই পাইবেন।

আরে চাই না মিঞা তোমার কেউরে জিগাইবার। এই নেও, বলতে বলতে রুমাল খুলে একটা আনি ওসমানের হাতে দিতে যায় নকুলচন্দ্র।

ওসমান চোখ কপালে তুলে ফুঁসে ওঠে, ভিক্ষা খ্যান নাকি মশয়! চাইর পয়সার বি ত ঘোড়ার জিব্বাও ভিজব না!

না ভিজলে আমি কি করুম ? ইয়ার বেশী আমি কিছু দিবার পারুম না। তোমার লগে কিছু কতা আচিল নাকি ?

কতা আবার কি থাকব মশয় ! জিগান না বি মাইনষেরে। এই খলিল মিঞা,—অদূরেই খলিল গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকিয়ে [illegible], তার উদ্দেশে চেঁচাতে থাকে ওসমান।

নকুলচন্দ্র ফাঁপরে পড়ে। না, সব দিক দিয়েই জ্বালাতন শুরু হয়েছে আজ। নিজের কপালে নিজেই করাঘাত ক'রে ওসমানকে বাধা দেয়, এই মিঞা, কাম নাই কেউরে ডাইকা, এই নেও, আবার রুমাল খুলে আর একটা আনি হাতে গুঁজে দিতে যায়।

ওসমান দাঁও বুঝে আবার কোপ মারে, কি তামাশা করবার নৈচেন মশয় ! আর না ছ্যান এউগা সুকি বি ত দিবেন ! ঘোড়ায় খাইব সঙ্গে বি হ্যার মাহুত। আপনার আক্কল কি ?

আক্কল তুমি ভাল কইরাই দিলা মিঞা ! আর আক্কলের কতা মুখে আইন না। এই নেও, পিণ্ডি গিল গা ! রাগের মাথায় আরও তু' আনা পয়সা বার ক'রে দেয় নকুলচন্দ্র।

পয়সা চার আনা পেয়ে ওসমানের ঠোঁটে কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দেয়। নকুলচন্দ্রের কড়া কথার কোন জবাব না দিয়ে সোজা পাশের একটা সরাইখানায় গিয়ে ঢোকে। যাবার সময় ঘোড়া তুটোর মুখে ছোলা ভিজানো আর ঘাসের টিন বেঁধে দিয়ে যায়।

ওসমান আর ঘোড়া তুটো তবু এতক্ষণ পরে একটু হাঁপ ছাড়বার অবসর পায়। কিন্তু নকুলচন্দ্রের আজ ক্ষুধা-তৃষ্ণা বলে কিছু নেই। বিকেল ছটার গাড়িতে ফিরতে না পারলে অনেক রাত হয়ে যাবে। সামনে কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকার। রাস্তায় সাপ-খোপের ভয়ও কম নয়। তাড়াতাড়ি নেমে কেনাকাটায় মন দেয়। এক লহমায় পাঁচ সের ঢাকাই বল-সাবান, সোয়া সের সুগন্ধি আনারপুরী তামাক, এক কুড়ি কল্কে ও পাঁচ হাজার টিকে কিনে ফেলে। নির্দেশ মতো মুটেরা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ছাদে চাপিয়ে দেয়।

দেখে দেখে ওসমানের গায়ে জ্বালা ধরে। নতুন রং পালিশ

হয়েছে গাড়িখানায়। এই সমস্ত ছাইপাঁশ চাপিয়ে শেষটায় না দাগ ধরিয়ে দেয়। গেঁয়ো ভূত কোথাকার! ঘোড়ার গাড়ি না ক'রে মোষের গাড়ি করলেই তো পারতো।...কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। এইমাত্র নগদ চার আনা পয়সা ফাউ বাগিয়েছে, চক্ষু লজ্জা বলে তো একটা জিনিস আছে! নকুলচন্দ্রের কাণ্ড-কারখানা দেখে মুখ টিপে টিপে হাসতেই থাকে ওসমান। গেঁয়োটা শেষটায় না তামাম ঢাকা শহরখানা ছাদের ওপর চাপিয়ে দেয়।...

যা হোক, ভগবানকে ধন্যবাদ! মিনিট কুড়ি পঁচিশের ভেতরেই বাবুর বাজারের পাট মিটে যায়। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে গাড়িতে এসে বসে নকুলচন্দ্র। সমুখের খালি সীটটার ওপর পা তুলে দিয়ে একটু আরাম করতে থাকে।

ওসমানও খানিকটা চাঙ্গা হয়—মনের আনন্দেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে। এবার চক বাজার। নকুলচন্দ্র আশ্বাস দিয়েছে, এখানেই বাজার শেষ।

দেখতে দেখতে গাড়ি এসে চক বাজারের ছোট কাটরার সামনে এসে লাগে। অবসন্ন দেহেও কিঞ্চিৎ বল সঞ্চার হয় নকুলচন্দ্রের। মনের খুশীতেই গিয়ে ঢোকে কাটরার ভেতরে। সারা দোকান খোঁজ খোঁজ। কিন্তু না, কোথাও নিজের গায়ের মাপে একটা আলপাকার কোট পাওয়া যাচ্ছে না। দাম কম বেশী যাই হোক—অন্যান্য সওদা একরকম ক'রে প্রায় সবই হয়ে গেছে। শুধু মিলছে না এই কোটটা। অথচ না হলে চলেই বা কি ক'রে? পাঁচীর শ্বশুর তো শুনেছি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। সঙ্গে জনকয়েক সম্ভ্রান্ত বরযাত্রীই আসবে। নিজের বলতে তো একটাও ভাল জামা নেই। কোটটা হলে মানরক্ষা হতো। তা ছাড়া এই উপলক্ষে কেনা হলেই হলো, নয়তো কবে আর আসছে শুধু একটা কোট কিনতে? এক দোকানদার না করে তো নকুলচন্দ্র আর-এক দোকানে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেখানে বিফল হয়ে আবার আর-এক দোকানে, কিন্তু কেউ দিতে পারছে না ওর মনোমত কোট। সবাই বপু দেখে মুখ টিপে টিপে

হাসতে থাকে। বেটাদের যেন ঠাট্টার পাত্র আমি। অর্ডার দিলে তো গাঁয়ের দর্জিকে দিয়েও করিয়ে নিতে পারি রে হতচ্ছাড়ার দল। তবে আর তোদের দোর গোড়ায় ধরনা দেবো কেন? সে সময় নেই বলেই না তোদের দোরে দোরে ঘুরছি। অত চোখ টেপাটেপি কিসের? এত বড় তো দোকান সাজিয়ে বসেছিস, লজ্জা করে না, একটা কোট বার করতে পারছিস নে? কেন, জীবনে কি আমার মতো বপু কারো দেখিস নি নাকি!...নকুলচন্দ্র ঘুরে ঘুরে অস্থির হয়ে ওঠে। সারা গা দিয়ে অঝোরে ঘাম ঝরছে। লোমগুলো ভিজে জবজবে। ভালুকের মতোই দেখাচ্ছে হয়তো। বেটারা তাই হয়তো অত হাসছে। জামাটা গায়ে দিলে অবশ্য হয়। কিন্তু না, এখন আর সে উপায় নেই। হতচ্ছাড়ারা যা ভাবছে ভাবুক। ওদের দিকে না তাকালেই হলো। সারা কাটরা ঘুরে শেষটায় ব্যর্থ হয়েই গাড়ির দিকে ফিরে আসে নকুলচন্দ্র।

ওসমান কোচবাক্সের ওপর বসে একটা বিড়ি ফুঁকছিল, নকুলচন্দ্রকে দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, খালি হাতে আইলেন মাহারাজ? কিচু আনলেন না?

নকুলচন্দ্র বিরক্তির সঙ্গেই জবাব দেয়, কি আহুম মিঞা! তোমগ তামাম কাটরা ঘুইরা একটা আলপাকার কোট পাইলাম না।

ওসমান ততোধিক বিস্ময়ের সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করে, আলপাকার কোট পাইলেন না! কার গায়ের?

কার গায়ের আবার? নিজের লেইগাই চাইছিলাম।

আপনার লেইগা আলপাকার কোট? কন কি মাহারাজ! আপনার তামাম গায়ে না আলপাকার রইচে, চাউরগা (চারটে) বুতাম বি লটকাইয়া লন না, বাহারের কোট অইব নে।

ওসমানের রসিকতায় রেগে উঠতেই যাচ্ছিল নকুলচন্দ্র কিন্তু কি জানি কেন ফিক ক'রে হেসে ফেলে। নিজের খালি গায়ের দিকে তাকিয়ে শেষটায় মটকার পাঞ্জাবিটাই চড়িয়ে নেয়।

গাড়ি রেল স্টেশনের পথে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে।

জামাই আদর

ঢাকার দেওয়ানী আদালত। সাভার থেকে সুধামোহন আসে খতের মামলা নিয়ে। দলিলের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, আজকেই মামলা রুজু করা চাই। উকিলবাবুর হাতে কাগজপত্র দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত সুধামোহন। সকাল আটটার মধ্যেই লঞ্চ ঘাটে পৌঁছবে। কাছারি বসবে দশটায়। হাতে সময় থাকবে পাক্কা দু'ঘণ্টা। এই দু'ঘণ্টায় নাওয়া খাওয়া অনায়াসেই মিটিয়ে নেওয়া যাবে। তেমন কোন ভয় ভাবনার নেই। সোহাগী তো অনেক ক'রে বলে দিয়েছে ওর বাপের বাড়ি উঠতে। লঞ্চ সদর ঘাটে লাগবে। সেখান থেকে চৌধুরী বাজার দীর্ঘ পথ। যাতায়াতে কম ক'রেও এক ঘণ্টা চাই। তা হোক, সোহাগীর কথা ও ফেলতে পারবে না। প্রাণের প্রাণ সোহাগী। গেলো মাঘে ওদের বিয়ে হয়েছে। সেই থেকে দু'জনে একসঙ্গে আছে। একদিনের জন্যও চোখের আড়াল হয় নি সোহাগী। হতে দেয়ও নি। না না, সোহাগীর অনুরোধ ওকে রাখতেই হবে। উকিলবাবু তো সদর ঘাটেই থাকেন। তাড়াতাড়ি তাঁর হাতে কাগজপত্র পেঁাছে দিলেই হলো। দেওয়ানী মামলা, নিজে দু'পাঁচ মিনিট পরে গেলেও ক্ষতি নেই। হ্যাঁ তাই হবে, উকিলবাবুকে কাগজপত্র দিয়ে সোজা যেতে হবে কালাচাঁদের দোকানে। একখানা ঘোড়-গাড়ি ক'রেই যেতে হবে। এই সর্বপ্রথম শ্বশুরবাড়ি যেতে হচ্ছে, খালি হাতে তো আর যাওয়া যায় না। সোহাগী অবশ্য বাছাই এক ঝুড়ি গাছের আম সঙ্গে দিয়েছে। তা হোক, শুধু আম দেওয়া ভাল দেখাবে না। ফলের সঙ্গে কিছু মিষ্টি, এতো শাস্ত্রেই আছে। ভাল দেখে সন্দেশ কিছু চাই-ই। অতি উৎকৃষ্ট কালাচাঁদের 'প্রাণহরা' সন্দেশ। ওদের লালমোহনের তো তুলনাই হয় না। টাটকা পেলে লালমোহনও সের আড়াই নেওয়া যাবে। আহা-হা, লালমোহন

নয় তো যেন মাখনের চাকা। মুখে ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই গলে মধু। খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা দেবভোগ্য জিনিস।…লঞ্চে বসে সময়-সূচী ঠিক করে সুধামোহন। হ্যাঁ, এই বেশ ভাল ব্যবস্থা হলো, প্রথমে উকিল বাড়ি পরে মথুরাপুরী। মাঝে কালাচাঁদের দোকান। সব মিলিয়ে কিছুতেই দু'ঘণ্টার বেশী লাগবে না।…সুধামোহন নিশ্চিন্তে একটা সিগারেট ধরিয়ে স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে। ভাটির পথ, ভরা ধলেশ্বরীর ওপর দিয়ে দৌড়ে চলেছে লঞ্চ। বর্ষার ভিজে বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে। বেশ উৎফুল্লই দেখায় সুধামোহনকে।

উৎফুল্ল হয়েই পথ চলছিল সুধামোহন, সহসা মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। মালিকান্দার কাছে এসে লঞ্চের একটা চাকা কেমন ক'রে যেন বিগড়ে যায়। আধাআধি পথও আসে নি। সারেঙ মিস্ত্রীরা সাধ্যমতো চেষ্টা ক'রে হাল ছেড়ে দেয়। অগত্যা এক চাকার ওপর ভর ক'রেই চলতে থাকে লঞ্চ। এভাবে চললে আটটার জায়গায় দশটায় গিয়ে পৌঁছবে কিনা সন্দেহ। শ্বশুরবাড়ি মাথায় থাক—কাছারি-রক্ষা হয় কিনা সেই ভয়েই ভেঙে পড়ে সুধামোহন। ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখে বিরক্তি বোধ করে, কিন্তু করার কিছু নেই। পথ এই একটিই।

যা ভেবেছিল সুধামোহন ঠিক তাই হয়। দশটা দশে এসে লঞ্চ ঘাটে লাগে। তাড়াতাড়ি নেমে একটা ঘোড়-গাড়ি ক'রে সটান দৌড় দেয় কাছারির দিকে। আমের বোঝা নিয়ে হয় এক জ্বালা! কোথায় কার কাছে রাখে ও এই ভারী বোঝা। সোহাগী তো বলে দিয়েই খালাস—ওর তো এখন প্রাণ যায়। থাক, চোর-ছেঁচড়েই খাক। ও আর কি করতে পারে। কত ক'রে বারণ করেছিল, আম দিয়ে কাজ নেই, মিষ্টি দিলেই যথেষ্ট।…

ঘোড়া নয় তো যেন পক্ষীরাজের বাচ্চা। বকশিশের লোভে গাড়োয়ানের হাতে চাবুক খেয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এসে কাছারির দরজায় লাগে গাড়ি।

সুধামোহন পড়ি কি মরি গাড়ির দরজা খুলে মাটিতে লাফিয়ে

পড়ে। গাড়োয়ানের হাত থেকে আমের ঝুড়িটা তাড়াতাড়ি টেনে নামাতে যায়।

কিন্তু ভাগ্য সুধামোহনের সুপ্রসন্নই বলতে হবে। শ্বশুর শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাসও ব্যক্তিগত কাজে কাছারিতে এসেছেন। কাজ চুকিয়ে সদরের বাইরেই আসছিলেন উনি, সুধামোহনকে দেখে গদ্‌গদ হয়ে কাছে ছুটে আসেন। হাসিভরা মুখে কুশল প্রশ্ন করেন।

সুধামোহন স্তম্ভিত হয়। আমগুলোর তাহলে সদ্‌গতি হলো। খোয়া গেলে সোহাগী কি রক্ষা রাখতো!···কুশলের বিনিময়ে পাল্টা কুশল প্রশ্ন ক'রে তাড়াতাড়ি শ্বশুর-মশায়ের পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকায় সুধামোহন।

শ্বশুর শ্যামসুন্দর কুশল জ্ঞাপন ক'রে তাড়াতাড়ি আমের ঝুড়িটা নিজের জিম্মায় টেনে নেন। মিষ্টি গন্ধে মিষ্টি রসের সঞ্চার হয় জিভের ডগায়। খাসা গাছ পাকা বড় বড় আম।

নিজেগ গাছের আম নাকি?—খুশী হয়েই প্রশ্ন করেন শ্যামসুন্দর।

সুধামোহনের দাঁড়াবার সময় নেই। ছোট্ট ক'রেই জবাব দেয়, আজ্ঞে হ্যাঁ, সোহাগী আপনাদের জন্য দিয়েছে। ভালই হলো আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। আমার সময় নেই, আমি চললুম।

সুধামোহন ঘুরে কাছারির দিকেই পা বাড়ায়, শ্যামসুন্দর ঝুড়ি থেকে একটা আম তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে দেখতে থাকেন। সুবিধা-মতো কারো সঙ্গে ভাগে একটা গাড়ি পেলেই বাড়ি রওনা হবেন।

সুধামোহন প্রায় কাছারির ভেতরেই ঢুকতে যায় হঠাৎ খেয়াল হয় শ্যামসুন্দরের, তাই তো, বাবাজীবনকে তো আদর-অভ্যর্থনা কিছু করা হলো না? তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে হাঁকেন, জামাই—জামাই—

তাড়াহুড়োর মধ্যেও শ্বশুরের ডাকে পেছন ফিরে দাঁড়ায় সুধামোহন।

শ্যামসুন্দর কাছে গিয়ে অনুনয় করেন, কাজের সময়ে বি আপনারে পিছন ডাকলাম। তা খাইবেন ত বি হৈটালেই, যাইবার সময়ে আপনার শাশুড়ীর লগে একবার দেখা কইরা যাইয়েন।

সুধামোহন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আবার ছুটতে থাকে। তাড়াতাড়িতে কোন কথা খেয়াল করে না।

শ্যামসুন্দর আমের ঝুড়ি নিয়ে অপেক্ষায় থাকেন।

বেলা একটা নাগাত কাছারির ঝামেলা মিটে যায় সুধামোহনের। কিন্তু মুশকিল হলো কাল অবধি থাকতে হবে। দেরিতে আসায় আজ শুনানী হতে পারে নি। সুধামোহনের বড় ভাবনা হয়। সোহাগীকে কথা দিয়ে এসেছে আজকেই ফিরবে। সারা রাত পথ চেয়ে কাটাবে বেচারা। কিন্তু কি আর করবে? মামলা-মোকদ্দমার কথা তো কেউ নিশ্চয় ক'রে বলতে পারে না! এও তো ভাবতে পারে, ওর ভাইবোনরা জামাইবাবুকে পেয়ে কিছুতেই ছাড়লে না। না না, সোহাগী কিছুটা ভাবলেও রাগ করবে না। বরং খুশীই হবে বাপের বাড়ির আদর-আপ্যায়নে।...ভাবতে ভাবতেই কাছারি থেকে বেরোয় সুধামোহন। বড় খিদে পেয়েছে ওর। দৌড়-ঝাঁপে এতক্ষণ বুঝতে পারে নি। এখন তো পেটের ভেতরে ছুঁচোয় গুঁতোচ্ছে। না, হেঁটে আর যাওয়া যাবে না। কাছারি থেকে চৌধুরী বাজার— ওরে বাবা, পাক্কা দু' মাইল হবে। একটা গাড়ি ডাকতেই যায় সুধামোহন। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে শ্যামসুন্দরের কথা। কি বলে গেলেন উনি? যতদূর খেয়াল হচ্ছে—হোটেলে খেতেই তো বলে গেলেন। যাবার সময় শুধু শাশুড়ী ঠাকরুনের সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। ছি ছি ছি, এমন আদর-আপ্যায়নেও মানুষ শ্বশুরবাড়ি যায়! সোহাগীকে গিয়ে সাফ বলবো, তোমার আম পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু—না না, সোহাগীকে কিছু বলা যাবে না। বেচারা মনে কষ্ট পাবে। বাপের বাড়ির নিন্দে কোন মহিলাই সহ্য করতে পারেন না। তাছাড়া উনি তো তেমন ভেবে বলেন নি কথাটা। চোখের ওপরেই তো দেখলেন, ভীষণ ব্যস্ত আমি। খাবার সময় তো তখন সত্যি গড়িয়ে গিয়েছিল। কাজ কখন শেষ হবে তাও জানতেন না। তাই ধারে-কাছে হোটেলের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সত্যিই তো, এখন

কি আর অতটা পথ যেতে ভাল লাগছে ? সরল মানুষ সহজ ক'রেই সত্যি কথা বলেছেন। এতে আবার আদর-আপ্যায়নের কথা উঠবে কেন ? বেশ বিনয়ের সঙ্গেই তো অনুরোধ ক'রে গেলেন শাশুড়ী ঠাকরুনের সঙ্গে দেখা করতে। সাবেকী মানুষ, ওঁরা তো ও-ভাবেই কথা বলেন। ছি ছি ছি, খুব অন্যায় ভাবা হয়েছে ওঁদের সম্বন্ধে।... সুধামোহন আর ভাবতে পারে না। একটু জিরিয়ে নিয়ে বিকেলেই যাবে শ্বশুরবাড়ি। এখন দেরি করলে আর হোটেলে ভাত পাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি একটা গাড়ি ডেকে উঠে পড়ে। চক বাজারে ওর জানাশুনো হোটেল রয়েছে—আদর্শ হিন্দু হোটেল।

বিকেল পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠে সুধামোহন। হাত-মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নেয়। পাট-ভাঙা আর-এক প্রস্ত জামা-কাপড় হলে জুতসই হতো। কিন্তু তার তো আর কোন উপায় নেই। সুতরাং যা পরেছিল তাই পরিপাটি ক'রে পরে চৌধুরী বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়েই যায়। কেন না, ও তো আর হোটেলে ফিরে আসছে না।

রাস্তায় পা দিয়ে ভাবে, সামনের রেষ্টুরেণ্ট থেকে একটা মরিচ টোস্ট ও এক কাপ চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নেয়। খানিকটা এগিয়েও যায় রেষ্টুরেণ্টের দিকে। কিন্তু ঢোকে না। দূর ছাই, এখন আবার এসব বাজে জিনিস খেয়ে পেট ভরানো কেন ? বিয়ের প'র এই প্রথম যাচ্ছি শ্বশুরবাড়ি, শুধু চা কেন সঙ্গে টার ব্যবস্থাও থাকবে প্রচুর। সুধামোহন উচ্ছ্বাসে গদ্‌গদ হয়েই এগিয়ে যায়। একটা গাড়ি নিয়ে ছোটে কালাচাঁদের দোকানে। সেখান থেকে পছন্দসই মিষ্টি কিনে সটান যাবে চৌধুরী বাজার।

কিছুটা এগুতেই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যায় সোহাগীর ছোট ভাই বাবলুর সঙ্গে। ছুটির পর স্কুল থেকে ফিরছিল বাবলু।

সুধামোহন গাড়ি থামিয়ে বাবলুকে তুলে নেয়। দু'জনে গল্প করতে করতে এসে হাজির হয় কালাচাঁদের দোকানে।

বড় বড় পেতলের গামলায় ভাসছে মনোহারী লালমোহন, রাজভোগ, ছানার অমৃতি। রকমারি সন্দেশ, গজা, চমচম কাতারে কাতারে সাজানো। ভেতরে পরোটা ভাজা হচ্ছে। গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ ভুরভুর করছে। সুধামোহন স্থির থাকতে পারে না। বাবলুকে খাওয়াতে গিয়ে নিজেও একটার পর একটা চালিয়ে যায়। জল খেয়ে পেট তো এখন জয়ঢাক। শ্বশুরবাড়ির চা জলখাবারের কথা ভুলেই গিয়েছিল। উঠে দাঁড়াতেই বোঝে, এখন আর জলবিন্দুও রুচবে না। কিছুটা আপসোসই হয়। যাক, বাবলুকে যখন পাওয়া গেছে তখন ওর হাতে বাড়ির অন্যান্য সকলের জন্য মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়ে কিছু ঘুরে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। এ বরং ভালই হলো। জামা-কাপড়ের ইস্তিরি নেই—রাত্রে তেমন বুঝা যাবে না। ওঁরাও যোগাড়-যন্ত্রের ফুরসত পাবেন।...

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তাই করে সুধামোহন। আড়াই সের লালমোহন ও আড়াই সের 'প্রাণহরা' বাবলুর হাতে পাঠিয়ে দেয়। নিজে ছোটে সদরঘাটে উকিলবাবুর সঙ্গে কাজ মিটিয়ে নিতে। সময় যখন পেলো তখন আর কাল সকালে দৌড়-ঝাঁপের অপেক্ষায় থাকা কেন? তাছাড়া শ্বশুরবাড়ির খাওয়া—গুরুভোজনের পর যদি ভোরে না উঠতে পারে? এতো জানা কথা, ওঁরা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না। মিছিমিছি বার কয়েক গাড়িভাড়া দিয়েই মরতে হবে। তার চেয়ে আজ কাজ মিটিয়ে যেতে পারলে কাল নিশ্চিন্ত। ওঁদের বাড়ি থেকে একবারে গরম ভাত খেয়ে সোজা কাছারি—সেখান থেকে বাড়ি।

উকিলবাবুর সঙ্গে কাজ শেষ ক'রে উঠতেই যাচ্ছিল সুধামোহন এমন সময় উকিলবাবুর জনকয়েক বন্ধু এসে হাজির হন।

একজন দাঁড়িয়ে থেকেই উকিলবাবুকে তাড়া দেন, কই হে মুখার্জি, ওঠো, ছ'টা বাজে যে?

নির্দিষ্ট সময়েই এসেছেন বন্ধুরা। উকিলবাবুর ওঠাই উচিত। তবু মক্কেলদের মান রক্ষা হেতু বাধা দেন, এঁরা সব রয়েছেন, আমার সময় হবে না ভাই, তোমরা এসো।

সময় হবে না মানে? নগদ পয়সা খরচ ক'রে তোমার টিকেট কাটা হয়েছে, ওঠো ওঠো। মাপ করবেন স্যার, আপনারা যদি দয়া ক'রে কাল সকালে আসেন, উকিলবাবুকে তাড়া দিয়ে সুধামোহনকে লক্ষ্য ক'রেই জোড়হাত করেন ভদ্রলোক।

সুধামোহন পাল্টা হাতজোড় ক'রে উত্তর করে, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে স্যার—আমি এক্ষুণি উঠছিলাম, উঠে দাঁড়ায় সুধামোহন।

সুধামোহনের দেখাদেখি বাকী দু'জনও। ওরা না দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়েই যায়।

সুধামোহন খানিক ইতস্তত ক'রে ভদ্রলোককে প্রশ্ন করে, কিছু যদি মনে না করেন স্যার, কোথায় যাচ্ছেন জানতে পারি কি?

বিলক্ষণ। জাদুসম্রাট সরকার সদলবলে ঢাকায় এসেছেন। আজ শেষ শো। আশ্চর্য খেলা মশায়, চলুন না? হেসে উত্তর করেন ভদ্রলোক।

ম্যাজিকের কথা শুনে সুধামোহন লাফিয়ে ওঠে। জাদুসম্রাট সরকারের ম্যাজিক! এ পর্যন্ত নামই শুধু শুনে এসেছে—চোখে দেখবার সুযোগ পায় নি। গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু—সুধামোহন ইতস্তত করতে থাকে।

উকিলবাবু সায় দেন, বেশ তো, চলুন না সুধামোহন। সকলে মিলে একসঙ্গে দেখে আসা যাক।

তা গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু ক'টায় ভাঙবে?—সুধামোহন শুধোয়।

ক'টা আর? বড় জোর সাড়ে ন'টায়।

সুধামোহন ভাবে, সাড়ে ন'টা আর এমন কি রাত? বাবলুকে সঙ্গে আনলে মন্দ হতো না। তা যাকগে, সুধামোহন রাজী হয়ে যায়।

সকলে মিলে গাড়িতে উঠে পড়ে।

শো ভাঙে কাঁটায় কাঁটায় ন'টা পনেরোয়। অতি আশ্চর্য খেলা। চোখের সামনে গোটা মেয়েটাকে কেটে দু'খানা ক'রে ফেললে! এ তো কোনরকম ভোজবাজী নয়। কিন্তু আশ্চর্য, পরের দৃশ্যেই আবার সেই মেয়েটাই উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালে। হাত সাফাই হলেও এ এক অতি অদ্ভুত রকমের হাত সাফাই। আর যদি ক'টা দিন থাকতো সোহাগীকে এনে দেখানো যেতো।...সকলের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক ভদ্রতা রক্ষা ক'রে গাড়িতে এসে ওঠে সুধামোহন। কোন রকম উৎকণ্ঠা নেই। বেশ সময়মতোই পৌঁছনো যাবে। খিদেও এখন কিছুটা পেয়েছে। ওঁদের আয়োজনের কোন জিনিস ফেলা যাবে না।...

গাড়ি পাক্কা দশটায় এসে চৌধুরী বাজারে পৌঁছয়। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সদরে এসে দাঁড়ায় সুধামোহন। এক হাতে কোঁচাটা বাগিয়ে ধরে আর-এক হাতে মৃদু কড়া নাড়ে। কিন্তু কোন সাড়া নেই। সুধামোহন কিছুটা লজ্জায়ই পড়ে। কান খাড়া ক'রে খানিক নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। যদি বাবলুর সাড়া পাওয়া যায় নাম ধরেই ডাকবে। কিন্তু না, কাক প্রাণীরও কোন সাড়াশব্দ নেই। সমস্ত বাড়িটাই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। সদর ভেতর থেকে বন্ধ। সুধামোহন অনন্যোপায় হয়ে আবার কড়া নাড়ে। আগের চেয়ে অনেকটা জোরেই নাড়ে। কিন্তু তবু কোন সাড়া নেই। বাড়ি ভুল করলো না তো? না না, তা কেন হবে? এই তো ফলকে লেখা রয়েছে 'দাশ লজ'।

দশটায় এসেছে এখন তো সাড়ে দশটা বাজে। হাত ঘড়িতে সময় দেখে মুষড়ে পড়ে সুধামোহন। এমন কি রাত ক'রে এসেছে ও! বাড়িতে এতোগুলো লোক—এরই মধ্যে সব ঘুমিয়ে পড়লো! ছেলে বুড়ো সব? না না, এ শয়তানী—ধাপ্পাবাজী!...রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে সুধামোহনের। কিন্তু কি করবে? কোন উপায়ই যে নেই। একটু স্থির হয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। ভেবে কিছুটা আশ্বস্তই হয়। সোহাগীর বোন তামাশা করছে না তো? ঢাকার মানুষ তো খুব রগুড়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে। নয় তো জামাইকে কেউ কখনো

নেমন্তন্ন ক'রে সদর থেকে ফিরিয়ে দেয়? তাও কিনা নতুন জামাই? ভেঙে পড়েছিল সুধামোহন আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সোহাগীর বোনের নাম ধরেই ডাকে এবার। সঙ্গে সমতা রেখে মৃদু মৃদু কড়া নাড়া। মৃদু থেকে জোরে—আরও জোরে। কিন্তু না, কোন সাড়াশব্দই নেই। সমস্ত বাড়িটা যেন নেশা ক'রে ঘুমিয়ে পড়েছে।··· সুধামোহন আর ভাবতে পারে না। এখনও ফিরে গেলে হয়তো হোটেলের দরজা খোলা পাওয়া যাবে। এর পরে রাস্তায় ছাড়া ঠাঁই হবে না। সুধামোহন তাই যাবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর ও অপমান বরদাস্ত করবে না। কিন্তু সঙ্গের ঘোড়-গাড়িটা ছেড়ে দিয়েই তো হয়েছে আর-এক জ্বালা। ধারে কাছে যে একটা গাড়িও নেই! হেঁটে গেলে তো নির্ঘাত বারোটা বাজবে। রাস্তায় পুলিসে ধরলেই বা করছে কি! ভাগ্য—ভাগ্য—মানুষের এমন ভাগ্যও হয়? নিরুপায় সুধামোহন অগত্যা হাঁটা পথেই পথ ধরে। সারা দিনের ক্লান্তিতে হাত-পা অবশ। না, এতোটা পথ ও কিছুতেই হেঁটে যেতে পারবে না। আর খানিকটা এগুলেই তো রমনার ফাঁকা মাঠ। পুলিস যদি তাড়া না করে তাহলে রমনার মাঠেই একটা গাছের নিচে রাত কাটিয়ে দেবে। পেটে খিল দিয়েই কাটিয়ে দেবে। কি করবে? শ্বশুরবাড়ির মোগলাই খানা যে ওর ভাগ্যে নেই। যম যাতনাই ওর ভাগ্যের লিখন।···হাতির মতো পা ফেলেই এক-পা এক-পা ক'রে এগুতে থাকে। বাঁকের মোড়েই পড়ে মা ঢাকেশ্বরীর মন্দির। সন্ধ্যারতির পর সুপ্তিমগ্ন দেবী। মন্দির-দ্বার বন্ধ। দেবী দর্শন আর ভাগ্যে হয় না। মনে মনেই মাকে স্মরণ করে সুধামোহন। একান্ত ভক্তি ভরেই ডাকে। মা-ই যদি ওকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।··· মন্দির প্রাঙ্গণে কপাল ছুঁইয়ে আবার চলতে থাকে। কিন্তু বেশী দূর যেতে হয় না। মা বোধ হয় সত্যি ওর প্রতি প্রসন্ন হন। হঠাৎ একটা চলতি গাড়ির শব্দ কানে ভেসে আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘোড় গাড়িই, ঐতো বাঁক ঘুরে এসে পড়লো। ঝিমিয়ে পড়েছিল সুধামোহন—হন্তদন্ত হয়ে কাছে ছুটে যায়। হেঁকে গতি রোধ করে।

উল্টো পথের গাড়ি—গ্যারেজে ফিরছে। গাড়োয়ান কিছুতেই রাজী হতে চায় না। গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যেতেই উদ্যোগ করে—ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারে। সুধামোহন তাড়াতাড়ি গাড়ি আঁকড়ে ধরে অনুনয় করে, শরীরটা বড্ডো খারাপ ভাই, হাঁটতে পারছি নে। দয়া ক'রে পেঁাছে দাও—যা চাও দেবো।

এক টাকা কবুল ক'রে গাড়িতে ওঠে সুধামোহন। ডবল ভাড়া, চলতে চলতে বুক ঠেলে কান্না আসে। কি ফেরেই না পড়েছে। গাঁট-গচ্চা দিতে দিতে ফতুর। নগদ দশ টাকা গুনে দিতে হয়েছে কালাচাঁদের দোকানে। দফায় দফায় গাড়ি ভাড়া। না, ওর কপালই মন্দ। নইলে আর এমন হবে কেন?

হোটেলের সব খাবারই প্রায় শেষ। সদর দরজার এক পাটিও বন্ধ হয়ে গেছে। মালিক হিসেবের অঙ্ক মিলিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, সুধামোহন এসে হাজির হয়। কিছুটা বিস্মিতই হয় মালিক। নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে তির্যক্ দৃষ্টি হেনে প্রশ্ন করে, খাবেন তো?

রাস্তায় চলতে চলতে ঠিক করেছিল সুধামোহন আজ আর জল-বিন্দুও স্পর্শ করবে না। গাঁট থেকে আর একটা পয়সাও খসাবে না। এর চেয়ে মামলা করতে না এসে গফুরকে মাফ ক'রে দেওয়াই ছিল ঢের ভাল। কাছারি খরচ আর ঠগের খরচ মিলিয়ে সুদের কড়ি তো সব গেলোই আসল গিয়েও কোথায় দাঁড়াবে বলা যায় না। না, আর কিছু খাবে না। গলা ধাক্কা তো কষেই খেয়েছে।··· সুধামোহন না বলতেই যাচ্ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না। না খেয়ে করবে কি? মিছিমিছি লাঞ্ছনাই বাড়বে। রাত্রে ঘুম হবে না। গাড়িভাড়া মিটিয়ে দিতে দিতে সুধামোহন হ্যাঁ বলেই সম্মতি জানায়।

হাঁড়ি হেঁসেল ধুয়ে-পুঁছে ঠাকুর-চাকর নিজেদের খাবার নিয়ে বসতে যাচ্ছিল মালিকের নির্দেশে সুধামোহনের জন্যও একখানা ঠাঁই হয়। সুধামোহন একা কেন আরও জনকয়েক থাকলেও মালিক না বলতো না। মা লক্ষ্মী স্বয়ং সদাসর্বদা হোটেলের ভাঁড়ার ধরে আছেন। অঙ্গুলি স্পর্শেই দু'দশজনের খাবার তৈরি হয়ে যায়।

রাবণের চুলা, চব্বিশ ঘণ্টাই হাঁড়ি-ভর্তি গরম জল ফুটছে। হাতা দিয়ে তুলে ডাল-ঝোলে মিশিয়ে দিলেই হলো।

সুধামোহন ও নিয়ে মাথা ঘামায় না। ভাল খাবার বরাতে থাকলে আর হোটেলে ফিরে আসবে কেন? যা পায় কোনরকমে গলাধঃকরণ ক'রে উঠে পড়ে। দু'আনা সিট ভাড়া কবুল ক'রে একটা মশারি, তেলচিটে একটা বালিশ ও একটা মাদুর পায়। এক ঘরে বারো ভূতের রাত্রিবাস।

বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে যায়। সকলের সঙ্গে সুধামোহনও শয্যা নেয়। সকলের সঙ্গে নীরবে ঘুমিয়ে পড়তেই চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসে না। মাথার পোকাগুলো কিলবিল করতে শুরু করেছে। সোহাগীকে এখন হাতের মুঠোয় পেলে হতো। বাপের বাড়ির নাম আর কোনদিন ও মুখে আনুক ওকে খনা ক'রে ছাড়বো। উঃ, কি মশারে বাবা!—চটাস ক'রে ডান গালে একটা চড় মারে। আবার একটা বাঁ গালে। না, শালারা ঘুমোতে দেবে না। এটা কি একটা মশারি? জেলের জালেও যে এর চেয়ে ঠাস বুনানি থাকে। উঃ, বাপরে বাপ, পিঠ যে খুবলিয়ে খেলো শালারা!…চিত হয়ে শুয়েছিল সুধামোহন তাড়া খেয়ে উঠে বসে। অন্ধকারেই হাতড়িয়ে মস্ত বড় একটা ছারপোকা ধরে ফেলে রাগে মেরে ফেলে দুই আঙুলে টিপে। আঃ, কি দুর্গন্ধ…সুধামোহন আর বিছানায় থাকতে পারে না। মশারি সরিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসে। দোর খুলে রেলিংএ এসে দাঁড়ায়। রাগে গজগজ করতে থাকে হোটেলওয়ালার ওপর। একে তো শালা ডালের বদলে ফেন খাইয়ে পয়সা নিলে তাতে আবার মশা ছারপোকা লেলিয়ে দিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছে। নে শালা চামার তোর ঘাটের কড়ি। পরকালে জবাব পাবি। নগদ পয়সা নিবি শালা তাকিয়ে একটু দেখবি নে? মাদুর বালিশ কি শ্মশান থেকে কুড়িয়ে এনেছিস রে হতভাগা? দু'আনা পয়সা নিতে তো ছাড়লি নে?…না না, এ শালাদের বকে কি হবে? বরাত—সব বরাতে করে। উকিলবাবু কত ক'রে থেকে

যেতে বললেন। কিন্তু তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম এমন খিটকেল হবে? মানুষ শ্বশুরবাড়ি যায় না?...রাগে দুঃখে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে সুধামোহনের।

ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে তিনটে বেজে যায়। সুধামোহন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। হ্যাঁ, এই ঠিক কথা হলো। শঠে শঠ্যং সমাচরেৎ। আজ না হয় দরজা বন্ধ ক'রে কলা দেখিয়েছে। কিন্তু কাল ভোরে গেলে তো আর দরজা বন্ধ করে থাকতে পারবে না। ভোরে দরজা না খোলে সারা দিন বসে থাকবো। দেখি টেঁকের কড়ি খসে কি না?...ভেঙে পড়েছিল সুধামোহন, ভেবেচিন্তে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। প্রতিশোধ স্পৃহাই ওকে চাঙ্গা ক'রে তোলে।...

মানুষ ভাবে এক হয় আর-এক। বিছানায় ফিরে এসে অবিরত প্যাঁচ কষতে থাকে সুধামোহন। কষতে কষতে ক্লান্তিতে কখন যেন ঘুমিয়েই পড়ে। মশা, ছারপোকা কিছুই টের পায় না। কোথায় ভোরে উঠবে ওঠে বেলা ন'টায়। শ্বশুরবাড়ি তো দূরের কথা এখন তাড়াতাড়ি দুটো নাকে-মুখে দিয়ে কাছারির সময় ধরতে পারলেই বাঁচে। উকিলবাবু তো বলে দিয়েছেন কাঁটায় কাঁটায় দশটায় পৌঁছতে। মা ঢাকেশ্বরীকে স্মরণ ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে কাছারির দিকেই ছোটে সুধামোহন।

মা ঢাকেশ্বরী ওর মুখ রাখেন। সময়মতোই কাছারিতে হাজির হয় সুধামোহন। সর্বপ্রথমেই ওর ডাক পড়ে। সাড়ে দশটার মধ্যে মামলা খতম। দলিলের মেয়াদ রক্ষা হয়েছে। সুধামোহন স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে। গাঁট-গচ্চা তো অনেকেই দিয়েছে কিন্তু দলিল রক্ষা না হলে তো পথেই বসতে হতো। হাজার লাঞ্ছনার মধ্যেও কতকটা বল ফিরে পায়। না না, আর কোথাও নয়। ও সব ঘোরপ্যাঁচে কাজ নেই। এখান থেকে সটান লঞ্চে গিয়ে ওঠাই শ্রেয়। লঞ্চ অবশ্য বিকেল পাঁচটায় ছাড়বে। তা ছাড়ুক, ও আর শহরের ভেতরে একদণ্ডও থাকবে না। আবার কিসে কোন্ ঝামেলায় গিয়ে পড়বে তার ঠিক ঠিকানা নেই। তার চেয়ে লঞ্চে গিয়ে ঘুম দেওয়াই ভাল।

যারা স্বেচ্ছায় পাশ কাটাতে চায় কি দরকার তাদের ওখানে গিয়ে ঝামেলা বাড়াবার ?···ভাবতে ভাবতে রাস্তায় নেমে আসে সুধামোহন। সদরঘাটের দিকেই পা বাড়াতে যায়।

কিন্তু সুধামোহন পাশ কাটাতে চাইলে কি হবে ভাগ্য ওকে পাশ কাটাতে দেয় না। শ্যামসুন্দর কোথায় ছিলেন ভগবানই জানেন, ও রাস্তায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে পথ রোধ ক'রে দাঁড়ান। বিরক্তির সঙ্গেই সুধামোহনকে শুধোন, কাইল সারা রাইত বি কোথায় আচিলেন আপনে ? আপনার শাশুড়ী তুপৈর রাইত তক্ না খাইয়া না দাইয়া কান্‌বার কাটবার নৈল! কেমুন আক্কল বি আপনার ? কাইল রাইতে বি গেলেন না সকালেও বি গেলেন না! কত পিঠা পায়েস ফেলা গেল। ছি ছি ছি···

এক দমে কথা শেষ ক'রে নাক মুখ খিঁচোতে থাকেন শ্যামসুন্দর। সুধামোহন কোন উত্তর দেয় না। কি উত্তর দেবে ও ? অন্য কেউ হলে আগে কষে তু'গালে তুই চড় বসিয়ে দিতো পরে জবাব করতো। কিন্তু উনি যে ওর গুরুজন। হাজার হোক সোহাগীর বাপ তো ?··· সুধামোহন নীরবেই মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু শ্যামসুন্দর নীরব থাকেন না। ওষুধে কাজ হয়েছে দেখে গলার স্বর কিছুটা স্বাভাবিক ক'রেই আবার আরম্ভ করেন, যাউক, যা অইবার বি অইচে। এলা চলেন। আপনার শাশুড়ী বি কাউলকার থেইকা না খাইয়া রাইন্দা-বাইড়া বইয়া রইচে।

সুধামোহন নীরব থাকলেও মনে মনে রেগে টঙ হয়ে উঠছিল। আর তু'-পাঁচ কথার পর হয়তো উচিত জবাবই দিয়ে বসতো। কিন্তু শ্যামসুন্দরের উক্তিতে মুহূর্তে গলে জল হয়ে যায়। বলছেন কি উনি, সোহাগীর মা সেই থেকে না খেয়ে বসে আছেন! ছি ছি ছি, কি ভুলই না করেছি কাল ম্যাজিক দেখতে গিয়ে ? ওদের হয়তো একটু সকাল সকালই ঘুমিয়ে পড়া অভ্যাস। রাত হয়তো অনেকই হয়েছিল। ঘড়ি বন্ধ ছিল কিনা তাইবা কে জানে ? সুধামোহন নম্রভাবেই জবাব দেয়, আপনি যান আমি যাচ্ছি।

না না, ও যাওয়া-যাওয়ির বি কাম নাই, আমার লগেই লন। কাউলকা রাইতেই ত আপনারে খুঁজবার চাইছিলাম। কিন্তু কোথায় বি খুঁজুম আপনারে? শেষে আউজকা সকালে বি মনে পড়ল সাভারের হৈটালের কথা। ছেইখান থেইকা খোঁজ কইরাই ত বি এইখানে আইচি। লন, আমার লগেই বি লন, গাড়ি ডাকি। দোকান না অয় বি দেরিতেই খুলুম নে। আবে ঐ ব্যাটা গাড়োয়ান, এইদিকে আয় বে।—সুধামোহনকে তাড়া দিয়ে একটা ঘোড়-গাড়ি ডাকতে যান শ্যামসুন্দর।

না না, আপনি দোকান খুলুন গে আমি এক্ষুণি যাচ্ছি, লজ্জায় এতটুকু হয়ে পাল্টা অনুনয় জানায় সুধামোহন।

শ্যামসুন্দর নিমরাজী হয়ে আবার বলেন, ঠিক কন বি আপনে যাইবেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় যাবো, আপনি আসুন।

আইচ্ছা, তাইলে বি আপনে যাইয়েন। না গেলে আমার মাথা খান। আমি যাই, দোকান খুলি গা, বেলা বি কম অইল না। শেষবারের মতো অনুরোধ ক'রে শ্যামসুন্দর দোকানের দিকেই পা বাড়ান। কিছুটা যেন ভাবিতই দেখা যায় ওকে।

শ্যামসুন্দর অদৃশ্য হয়ে যান সুধামোহন পুলকে আত্মহারা হয়ে ওঠে। তাই তো, এই তো হলো আসল কথা। শ্বশুর শাশুড়ী কখনো জামাইকে আপদ ভাবতে পারেন? ছি ছি ছি, কি অন্যায়ই না কাল করেছি? আর একটু হলে তো ওর সঙ্গেও দেখা হতো না। সারা জীবন ভুল বুঝাবুঝি চলতো। ভাগ্যিস উনি সময়মতো এসে পড়েছিলেন।···সুধামোহন খুশীতে আটখানা হয়ে একটা গাড়ি ডাকে। সটান রওনা হয় চৌধুরী বাজার। যাবার পথে আবার কালাচাঁদের দোকানে গাড়ি থামিয়ে কিছু মিষ্টি কিনে নেয়। কাল তো সোহাগীর মা কিছুই মুখে দেন নি। ছেলেপুলের বাড়ি আজ কি আর কিছু আছে? তাছাড়া গরমে থাকবেই বা কেন? বেচারা, মনে মনে

হয়তো খুবই চটেছেন। দেখি বলে-কয়ে যদি কিছু খাওয়াতে পারি। গাড়োয়ানকে গাড়ি জোরে হাঁকাতেই তাড়া দেয় সুধামোহন।

প্রায় বারোটা—'দাশ লজ'-এর ফটকে গাড়ি এসে থামে। সদর আজও বন্ধ। সুধামোহনের রীতিমতো ভয় করে। ভাড়া মিটিয়ে মিষ্টির হাঁড়িটা হাতে ক'রে নেমে এসে মৃদু কড়া নাড়ে। না, আজ আর একটুও ভুগতে হয় না। কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সোহাগীর ছোট বোন এসে দোর খুলে দেয়। হাত থেকে তাড়াতাড়ি মিষ্টির হাঁড়িটা টেনে নেয়। সাদর সম্ভাষণে ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।

সুধামোহন সসঙ্কোচেই ওকে অনুসরণ করে। চুপি চুপি চোরের মতো। উঠোন থেকে ঘরে ঢুকতেই নজরে পড়ে, শাশুড়ী ঠাকরুন দিব্যি দুপুরের আহারের পর মেঝেয় শীতলপাটি বিছিয়ে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে পরমানন্দে পান দোক্তার আয়োজন করছেন। পানে চুন লাগিয়ে জাঁতি দিয়ে সুপুরি কুচোচ্ছিলেন উনি—সুধামোহনকে অতর্কিতে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা তুলে দেন।

সুধামোহনের হাসিমুখ মুহূর্তে কালো হয়ে ওঠে। মনের কোণে প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। তবু কর্তব্যবোধে এগিয়ে গিয়ে শাশুড়ী ঠাকরুনের পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকায়।

আশিস্‌বাণী বর্ষণে কসুর করেন না শাশুড়ী ঠাকরুন। কুশল প্রশ্নের পর আসল প্রশ্নে আসেন, কাউলকা ইস্কুলের থনে আইহা বাবলু কইল আপনে বি রাইতে আইবেন,—আইলেন না ক্যান ?

একটা কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। মিছিমিছি আপনাদের কষ্ট দিয়েছি, সত্যি কথা বলতে গিয়েও ঢোক গিলে মিথ্যে বলেই শাশুড়ী ঠাকরুনের মান রাখে সুধামোহন।

শাশুড়ী ঠাকরুন উচ্ছ্বসিত হয়েই বাধা দেন, না না, হের লেইগা কি ? কাম থাকলে বি আইবেন কেমনে ? আপনার শ্বশুরের লগে বি দেহা অইচে ?

হ্যাঁ, উনিই ত পাঠিয়ে দিলেন।

হ্যাহেন চে হের আক্কল ? আপনে আইলেন হ্যায়ও বি আপনার

লগে আইব ত ? বাবলুও ইস্কুলে গেচে—আমি ম্যায়া মাইনষে এহন কারে দিয়া বি কি আনাই ? হ্যার কামই বি এই রকম, একটা পানের খিলি মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে অক্ষমতা জানান শাশুড়ী ঠাকরুন।

সুধামোহনের ঢের শিক্ষা হয়েছে। মনে মনেই নাক কান মলে উত্তর করে, না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি এইমাত্র খেয়ে এসেছি। আপনার সঙ্গে শুধু একবার দেখা করতে এলাম। সোহাগী আবার জিজ্ঞেস করবে তো। আমি চললুম, ঘুরে দাঁড়ায় সুধামোহন। হাঁটতেই শুরু করে।

সোহাগীর ছোট বোন ততক্ষণে মিষ্টির হাঁড়িটা খুলে একটা লাল-মোহন খেতে খেতে ছুটে আসে। তাড়াতাড়ি পেছন থেকে বাঁ হাত দিয়ে সুধামোহনের জামা টেনে ধরে বাধা দেয়, বারে, যাইবেন মানে ? আমাগ বাইস্কোপ দেহাইবেন না ? আউজকা বি থাইকা যান।

দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেলে সুধামোহন। হাত দিয়ে জামা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, নারে, আজ আর থাকা যাবে না। কাজ আছে। আবার যখন আসবো তোকে নিশ্চয় বায়স্কোপ দেখাবো, সুধামোহন আবার পা চালিয়ে দেয়।

শাশুড়ী ঠাকরুন বোধহয় কিছুটা লজ্জা পান। সোহাগীর ছোট বোনকে ধমক দেন, যা ছেঁড়ী, পড়া নাই শুনা নাই দিন রাইত খালি খালি বি বাইস্কোপ !—শোনেন, যান ক্যান ? আপনে বি পর নাকি ? ঘরের ছেইলা। যা আচে তাই বি দুগা খাইয়া যান—শোনেন, মেয়েকে ধমক দিয়ে নিজে সুধামোহনের পেছু পেছু আসেন।

সুধামোহন মুখোশ খুলে দিতেই যাচ্ছিল কিন্তু ওর হাসিই পায়। হেসে হেসেই বলে, না, আমার খিদে নেই, আজ আর কিছু খেতে পারবো না। অন্যদিন এসে খাবো, সুধামোহন চলতে থাকে।

শাশুড়ী ঠাকরুন নাছোড়বান্দা। সুধামোহন একবার না করে তো উনি দশবার সমাদর করেন। অবশেষে হাত চেপে ধরেন সুধা-মোহনের, আর একদিনের কতা আর একদিন। আউজকা বি দুগা খাইয়া যান। আপনার শ্বশুর টাটকা কাচ্‌কি মাছ আনচে। সোবারের

বেজুন রঁানচি। হুগা খাইয়া যান—এউগা কামড়। আমার মাথা খান, বেজুন-ওজুন দিয়া বি এউগা কামড়। জামাই জামাই—সদর পর্যন্ত ছুটে আসেন শাশুড়ী ঠাকরুন।

সুধামোহন আর বরদাস্ত করতে পারে না। কোনরকমে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে টেনে এক দৌড়। পেছন ফিরে আর তাকায় না।

শাশুড়ী ঠাকরুন ডাকতেই থাকেন, জামাই—জামাই—হুগা—এউগা কামড়…

জাফর আলীর জুতো খরিদ

আরে আইয়েন আইয়েন বড় মিঞা! কি চাইলেন, পাম্‌সু না ডারবি?—পাটুয়াটুলির "ভ্যারাইটি সু স্টোর্স" থেকে সাদর সম্ভাষণ আসে জাফর আলীর উদ্দেশে। সম্ভাষণ জানায় স্টোর্স-এর মালিক স্বয়ং রম্‌জু মিঞা। খাসা গোলগাল চেহারা। পরনে গোলাপী রঙের রেশমী লুঙ্গি—গায়ে বুটিদার ভয়েলের পাঞ্জাবি। টানাটানা সুরমা-আঁকা চোখ। জাফর আলীকে দেখে গদ্‌গদ হয়েই সম্ভাষণ জানায় রম্‌জু।

গাঁয়ের মানুষ জাফর আলী। হাটে-বাজারে তুই-তুকারি শুনেই অভ্যস্ত। রম্‌জুর ডাকে হকচকিয়ে যায়। ওকেই ডাকছে কি? এপাশ ওপাশ চেয়ে দেখে। মনের কোণে খুশীর বান ডাকে।

কাঁঠাল বোঝাই নৌকো নিয়ে ঢাকায় এসেছে জাফর। কপাল-গুণে ব্যবসা নেহাত খারাপ হয় নি। পঞ্চাশ টাকায় এক নৌকো কাঁঠাল খরিদ ছিল। বিক্রি হয়েছে নব্বুই টাকা। প্রায় ডবল লাভ।

খোদায় দিন দিলে গাঁয়ের মোড়ল রহিম খাঁকে ছাড়িয়ে যেতে ক'দ্দিন আর লাগবে? কিন্তু শুধু টাকা হলেই তো আর মান বাড়বে না। চালচুলোও ধাতস্থ করতে হবে। জুতো এক জোড়া কিনেছিল সেই তেরো শ' পঁচিশ সালে। বর্তমানে এটা তেরো শ' ত্রিশ সাল। ইষ্টি-কুটুমের বাড়ি এখন আর এ জুতো পরে যাওয়া যায় না। কারবার যখন ভালই হয়েছে তখন পছন্দসই জুতো একজোড়া নিলে মন্দ হয় না। সঙ্গে একখানা রেশমী লুঙ্গি। আহা-হা, দোকানী ভাই কি বাহারের লুঙ্গি আর পাঞ্জাবিই না পরেছে। জুতোর সঙ্গে—ঐ রকম পাঞ্জাবিও এক প্রস্ত কিনতে হবে। এক শিশি আতর আর এক কৌটো সুরমা তো চাই-ই।…

শো কেসের জুতোর চেয়ে রমজুর লুঙ্গি পাঞ্জাবির আকর্ষণেই ভ্যারাইটি সু স্টোর্স-এ ঢুকে পড়ে জাফর। সঙ্গে গেহু আর ওসমান দুই সাঙাত। ঢুকে বেশ বিপদেই পড়ে। ওদের তো খালি পা, ধুলোয় মাখামাখি। অথচ সমস্ত মেঝে জুড়ে দামী কার্পেট বিছানো। শহরে এর আগেও বারকতক এসেছে। টুকিটাকি কিনেছেও প্রচুর। কিন্তু ভ্যারাইটি সু স্টোর্স-এর মতো এমন অভিজাত দোকানে এর আগে আর কখনো ঢোকে নি। দোকান নয় তো যেন এক ইন্দ্রপুরী। রহিম খাঁর বৈঠকখানাও এমন সুন্দর ক'রে সাজানো নয়! মেঝেতে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ায় জাফর। সঙ্গের সাঙাতরাও।

মালিক রমজু মিঞা সবই বোঝে। বুঝেই মুচকি মুচকি হাসে। হেসে আবার সম্ভাষণ জানায়, আরে আহেন আহেন। আপনাগ পদ-রজ আমাগ বি দানাপানি। উয়ার লেইগা বি শরম করেন কেন? আহেন আহেন, বলতে বলতে নিজের দামী লুঙ্গি দিয়েই চেয়ার তিনটে ঝেড়ে দেয়। মুখে শিউলি-ঝরা হাসি।

কিন্তু জাফরের তবু সংশয় কাটে না। বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। সাঙাতদের নিয়ে কোনরকমে এসে চেয়ারে বসে। ইচ্ছে হয়, কাঁধের গামছা নিয়ে হাত পা ঝেড়ে ফেলে। একি! কোমর অবধি যে ঢুকে গেলো চেয়ারের মধ্যে। শহরের লোক, কত কায়দাই না জানে! বেড়ালের গায়ের চেয়েও নরম তুলতুলে আসন। ভারি মজা তো! শেষটায় না সমস্ত শরীরটাই ঢুকে যায়। যতটা সম্ভব আলতো ক'রেই বসে জাফর। মুখ দিয়ে আর সহসা কোন কথা সরে না।

রমজু ওদের বিস্ময়ের সীমাকে আরও এক ডিগ্রী উস্কিয়ে দেয়। অধীনস্থের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ে, আরে ঐ বি বাচ্চা, বেপারী সাব্দের লেইগা পান বিড়ি বি লইয়া আয়, বলতে বলতে ফ্যানের সুইচটা টিপে দেয়। মাথার ওপরে পাঁইপাঁই ক'রে ঘুরতে থাকে বৈদ্যুতিক পাখা। ঘামে নেয়ে উঠেছিল তিনজন, আরামে স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে। এ কোথায় এল ওরা! শ্বশুরবাড়িতেও তো এমন যত্ন-আত্তি কোন-

দিন পায় নি !…লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে জাফর। তাড়াতাড়ি রম্‌জুকে বাধা দেয়, না না, পান-বিড়ির কাম নাই। তড়াতড়ি জোতাই ছ্যাহান্।

আরে করেন কেমুন বেপারী সাব্? আপনারা বি পর আইচেন নাকি? ই দোকান বি না আপনাগ পাঁচজনেরই, পাল্টা বাধা দেয় রম্‌জু।

জাফরের তবু সঙ্কোচ কাটে না।

রম্‌জু বলে, আরে রাখেন আপনার না না। একটু চা বি খান ত। এই গরমীর মদ্দে চা, না না…

থুরি, আমারই বি ভুল অইচে। গরমীতে বি চা খাইবেন কিয়েরে? ছরবৎ বি একটু খান। না না, আপনার আপত্তি আমি শুনুম না। আমার মাথা খান বি। ঐ বাচ্চা, মৈফার দোকান থেইকা তিন গেলাস ঠাণ্ডা ছরবৎ বি লইয়া আয়। তড়াতড়ি যা বে, ভাল কইরা গুলাপ পানি দিবার কৈইচ্।

সত্যি, জাফরের কোন আপত্তিই গ্রাহ্য হয় না। ট্রেতে ক'রে তিন গ্লাস শরবত আসে। রম্‌জু নিজের হাতে পরিবেশন করে সকলকে। তা ভালই হলো। তেষ্টায় গলাটা সত্যি শুকিয়ে উঠেছিল। শরবত খেয়ে তিন সঙ্গী শীতল হয়। খুশীতে বিড়ি ধরায়।

খুশী রম্‌জুও হয়। গদ্‌গদ হয়েই শুধোয়, এলা কন, ডারবি বি দিমু না পাম্‌সু?

ডারবি কাকে বলে আর পাম্‌সু কাকে বলে জাফর ঠাহর করতে পারে না। সঙ্গী গেন্থ বয়সে কিছুটা নবীন। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে সমতা রাখে, ছ্যান যেডা আপনার ভাল অয়।

রম্‌জু তিনজনের পায়ের দিকে তাকিয়েই মাপ ঠিক করতে যায়। গেন্থ বাধা দেয়, আমাগ কারো জোতা লাগব না। এই মিঞাজানরে একজোড়া ভাল দেইখা ছ্যান, জাফরকে দেখিয়ে ইঙ্গিত করে।

গেন্থর কথা শুনে রম্‌জু তেমন খুশী হতে পারে না। জাফরের পায়ের দিকে তাকিয়ে হতাশই হয়। দোকানে দশ নম্বরের চেয়ে

বড় জুতো নেই। অথচ জাফরের যা পা তাতে বারো নম্বর হলেই ভাল হয়। নিদেন এগারো নম্বর না হলে তো পায়ে ঢুকবেই না। শরবত পান বিড়ি বোধ হয় মাঠেই মারা যায়। কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়তে রাজী নয় রম্‌জু। ব্রাস দিয়ে ঝেড়ে-পুঁছে দশ নম্বর ডারবি জোড়াই বার করে। ঝাড়ন দিয়ে জাফরের পা ছ'খানি ভাল ক'রে ঝেড়ে বেশী ক'রে পাউডার লাগায়। জুতোর ফিতে সবটাই আলগা ক'রে দেয়। তার পর এক হাতে জুতো আর-এক হাতে জাফরের ডান পা'খানি ধরে কোনরকমে গলিয়ে দিতে চেষ্টা করে। বেদনায় চেঁচিয়ে ওঠে জাফর।

রম্‌জুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। খানিকটা ধস্তাধস্তির পর এক ঝাঁকে গলিয়ে দেয় পা'খানি। হয়তো ভেতরের সেলাই কিছুটা কেটেই যায়। কোচ্ পরোয়া নেই। রম্‌জু গদ্‌গদ হয়েই উচ্ছ্বাস জানায়, আপনার পাও বি যেমন সরস মানাইচেও বি জব্‌বর। নব্ সায়েবের অর্ডার আচিল, তা আপনেই বি লইয়া যান। বড় কপাল কইরা আইচিলেন। কাউলকা সকালে বি আইলে পাইতেন না। আউজকা বিকালেই ডেলিবারি অইয়া যাইত। তামাম শহর বি ঘুরলে পাইবেন না ইয়ার জোড়া চীজ্।...

পায়ের যাতনায় কান মাথা গরম হয়ে ওঠে জাফরের। রম্‌জুর একটানা প্রশংসায়ও বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করে না। কিন্তু সাহস ক'রে কিছু বলতেও ভয় পায়। শরবতের টাটকা ঢেঁকুর উঠছে। মুখ কাঁচুমাচু ক'রেই আপত্তি জানায়, পায়ে বড় লাগচে, আর এক-জোড়া বড় দেইখা ছান ?

আর বড় দিয়া কি করবেন বি ? ডিঙ্গি নাও কিনবার আইচেন নাকি ? চামড়াডার দিকে একবার চাইয়া ছাহেন। মকমলেরে বি কয় ঐ দিকে থাক। দিন ছুই পায়ে দিবেন ক্যাল্‌ক্যালাইয়া বি বড় অইয়া যাইব। একটু হাঁইটাই বি ছাহেন না, বলতে বলতে জাফরকে চেয়ার থেকে টেনে তুলে হাঁটাতে চেষ্টা করে রম্‌জু।

কিন্তু হাঁটা তো দূরের কথা উঠে দাঁড়াতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়

জাফরের। পায়ের ভেতরে যেন কেউটেয় ছোবল মারছে। ধপ্ ক'রে বসে পড়ে জুতো ধরে টানাটানি শুরু করে জাফর।

রম্‌জুর এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। খানিকটা বিরক্তির সুরেই বাধা দেয়, কি দিল্লাগী করেন বি! মায়ের প্যাটের থেইকা পইড়া হাঁটাও বি শিখেন নাই নাকি? ওঠেন ওঠেন...

জাফর কাতরাতে থাকে, না না জি, আর এক সাইজ বড় ছান। পায়ে বড় লাগচে।...

রম্‌জুর চোখ ছানাবড়া। শরবত পান বিড়ি মাঠেই মারা যায় তা'হলে। না না, তা হতে পারে না। গচাতেই হবে ওকে। রম্‌জু শেষ ছোবল মারে, আরে বেপারী সাব, বনীর সময়ে বি আইচেন, আপনার লগে দোকানদারি করুম না। চক্ষু বুইজা লইয়া যান। দুইদিন বাদে মালুম বি পাইবেন না। ঐ বাচ্চা, ভাল কইরা বে প্যাক কইরা দে। বার্নিশ বি এক কোট লাগাইয়া দিচ্, জাফরকে সান্ত্বনা দিয়ে জুতো জোড়া সহযোগীর দিকে এগিয়ে দেয় রম্‌জু।

কিন্তু জাফর রাজী হয় না। বাধা দেয়, না জি, এই মতোই আর একজোড়া বড় দেইখা ছান।

কথাডা বি ভাল লাগল না আপনার? আইচ্ছা, বড়ই বি আপনারে দেই। এই বাচ্চা, আবে যা না, লেহু পসারীর দোকান থেইকা দুই পয়সার আলকাতরা বি লইয়া আয়।

আলকাতরা! আলকাতরা কি?...জাফর অবাক হয়। গেহু ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করে, আলকাতরা দিয়া কি করবেন জি?

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে রম্‌জু উত্তর করে, বেপারী সাবের যে বড় জোতা চাই। মাপ বি লেওয়ন লাগব না?

আলকাতরা দিয়া মাপ নিবেন!

হ হ মিঞা, পাকা কাম। ঐ যে উনি শুইয়া বি আচেন, ওনার পিঠের উপরে বি বেপারী সাবের এউগা পায়ের ছাপ রাখবার চাই। ফরমাইজী পাও তো হালায়, তৈরি জোতা মিলব কোহান্ থনে? বেপারী সাব, ঢাকার জাদুঘরে আপনার পাও জোড়া বি দান কইরা

যান না, ইতিহাসে বি নাম থাকব, গেহুর প্রশ্নের জবাব দিয়ে জাফরের উদ্দেশে টিপ্পনী কাটে রমজু। দোকানের বিপরীত দিকে একটা ষাঁড় শুয়েছিল তার পিঠের ওপরেই পায়ের ছাপ রাখবার ইঙ্গিত করে।

অপমানে লজ্জায় জাফর লাল হয়ে ওঠে। মুখ দিয়ে কোন কথা সরে না। গেহু তবু মরিয়া হয়েই প্রতিবাদ করে, যান, কি মস্‌কারা করেন?

মস্‌কারা করুম! ক্যা, তোমরা কি আমার শালা না সম্বন্ধি? বনীর সময়ে আইচ মিঞা, জান না, দশ লম্বরের বড় তৈরি জোতা থাকে না!—ক্রোধে গর্জে ওঠে রমজু।

অপমানে জাফরও গর্জে উঠতেই যায়। কিন্তু পারে না। শরবতের আবার একটা ঢেঁকুর আসে। মাথা নত ক'রে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতেই মনস্থ করে। সঙ্গীদের সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

পেছন থেকে রমজু তেমনিই নক্কারজনক ভাষায় গালাগাল দিতে থাকে, যা-যা ব্যাটা চাষার পো, জোতা কিনা বি কি করবি? তার থনে বাবুর বাজার থেইকা বড় দেইখা একজোড়া খড়ম বি লইয়া যা। সময়ে পায়েও বি দিবার পারবি আবার বর্ষাকালে নায়েও বি চড়বার পারবি। যা যা ব্যাটা মুর্দাফরাস···

জাফরের ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে ছোটলোকটার গলা টিপে ধরে। পেছন ফিরে রুখেও দাঁড়ায়। পাড়াগাঁয়ের লোক—গায়ে রীতিমতো শক্তি রাখে। রমজুর মতো একশ'জনকে একাই ও কিলিয়ে খুন করতে পারে। কিন্তু গেহু তা হতে দেয় না। ও শুনেছে, ঢাকার কুট্টিরা যা খুশি করতে পারে। কথায় কথায় চাক্কুও চালাতে পারে। গেহু ঠেলতে ঠেলতেই স্টোর্স-এর বাইরে নিয়ে আসে ওকে। অপমানে লজ্জায় জাফর আর মুখ তুলে তাকায় না। রাস্তায় নেমে মন্তব্য করে, থাউক রে, আইজ আর জোতা কিনা কাম নাই। শালার ব্যাটা যা না তাই বলল।···

ওসমান এতক্ষণ নীরব ছিল এবার গর্জে ওঠে, আপনে তো মুখ দিয়া কিছু কইলেন না, নইলে এক ঘুষিতে শালার আমি নাক মুক ভাইঙ্গা দিতাম।

ছোটলোক শালা! বেচে ত জোতা, তার আবার ফুটানি কত। শালারে উচিত শিক্ষাই দেয়নের কাম আচিল। তা জোতা কিনবেন না ক্যান? ও শালার দোকান ছাড়া আর দোকান নাই নাকি? চলেন না, ভাল দেইখা জোতা একজোড়া আগে কিনা লই, তার পর ফিরবার পথে শালার ছুই গালে ছুই খান মাইরা যামুনে, গেছু সান্ত্বনা দেয়।

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সঙ্গীদের সঙ্গে এগুতে বাধ্য হয় জাফর। পেটের ভেতরে শরবত যেন মোচড়াচ্ছে। বমি করতে পারলে শান্তি হয়। রমৃজুর দেওয়া বিড়ি তখনো একটা পকেটে ছিল। তাড়াতাড়ি সেটা রাস্তার ড্রেনে ছুঁড়ে দিয়ে থুতু ফেলে জাফর। ছ' পাও এগুতে পারে না। পাশের স্টোর্স থেকে আবার জোরালো আহ্বান আসে। বিনয়ে রমৃজুর চেয়েও এরা আরও এক কাঠি সরেস। কিন্তু এত কাছাকাছি জাফরের ঢুকতে ইচ্ছে করে না। মডার্ন সুস্টোর্স-এর ডাকে কোন সাড়া না দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে গ্র্যাণ্ড সু কোম্পানীতে গিয়েই ওঠে। এখানে আর হতাশ হবার কোন কারণ নেই। শো কেসে বিরাট এক জুতো রয়েছে। ওর মতো চারখানা পা একত্রে ঢুকতে পারে। সদলবলে সেখানে ঢুকে পড়ে জাফর!

আদর-আপ্যায়নে এরা কারো চেয়ে কেউ কমতি নয়। পান বিড়ি এখানেও জোটে। শরবতের জন্যও পেড়াপীড়ি করে মালিক। কিন্তু না, ওরা আর কারও দেওয়া শরবত খাবে না। তাড়াতাড়ি জুতো দেখাবার জন্যই তাড়া দেয়।

হ্যাঁ, একেই বলে দোকান। শালা ভ্যারাইটি সু স্টোর্স ওর মাপে একজোড়া জুতো বার করতে পারে নি। খালি খালি বুক্‌নি ঝেড়েছে। এরা তো এককথায় তিন জোড়া জুতো ফেলে দিলে। জাফর খুশীতে ডগমগ। বিড়িতে একটা সুখ টান দিয়ে দামের কথা জিজ্ঞেস করে। কালো ডারবি জোড়াই ওর পছন্দ।...

দামের কথা জিজ্ঞেস করায় দোকানী আহ্লাদে গলে পড়ে। বত্রিশ পাটি বিকশিত ক'রে উত্তর করে, আপনে বি দশ দিনের গাহেক। আপনার লগে আবার দর করুম নাকি? ছ্যান নিজেই

ইন্‌সাফ কইরা। ঐ চান্দা, ভাল কইরা বি প্যাক কইরা দে। একটা বাক্সর মদ্দে বি দিচ, জাফরের প্রশ্নের জবাব দিয়ে প্যাকারের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ে দোকানী।

জাফর বিড়িতে আর-একটা সজোরে টান দিয়ে বাধা দেয়, না না, দাম না কইলে নেয়ন যাইব না। আগে কন, কত দেয়ন লাগব।

আপনারে লইয়া আর পারুম না সাব। হ্যান না বি আপনার মোন যা চায়।

না না জি, আপনেই কন, কি দেয়ন লাগব? হুদাহুদি আর দেরি কইরেন না। আমাগ নাও ছাড়বার সময় আইয়া গেল, জাফরকে ডিঙিয়ে গেছু উত্তর করে।

দোকানী গদ্‌গদ হয়ে প্রত্যুত্তর করে, চীজ ত জি এক লম্বর—খপ্‌ছুরুৎ। তামাম শহর বি ঘুরলে ইয়ার জুড়ি পাইবেন না। বনীর সময়ে আইচেন, হ্যান দউশ গ্যা টেকা।

জাফর মৌজ ক'রে বিড়ি টানছিল, দামের কথা শুনে ভিরমী খায়। হতবাক্ হয়েই বলে, কন কি জি, দশ টেকা!

বেশী কইলাম নাকি? ঝাড়া দশটা বচ্ছর পিন্‌বেন। আসল কানপুরী সোল। লোহারে কয় বি ঐ দিকে থাক।...

তা হউক, কি দেয়ন লাগব কন। ফাঁকাফাঁকিতে কাম নাই।

আপনে দেখচি আমাগ দানাপানি বি কিচুই দিবার চান না। বনীর সময়ে হ্যান এক টেকা কম। আবে ঐ মৈফা, তড়াতড়ি দে বে প্যাক কইরা।

না না, তাইলে আর নিবার পারলাম না। আর এক দোকান দেইখা আহি তাইলে, উঠে দাঁড়ায় জাফর।

কন কি সাব, বনীর সময়ে আপনারে আমি ছাড়ুম নাকি? আট আনা চাইর আনা—কন না বি আপনার মোন যা চায়। সস্তার জিনিস দেখবার চান ত কন, তাও বি দেখাই। ঐ, ফ্যালত রে—

না না জি, আর হ্যাখান লাগব না। কমসম করেন ত এই জোড়াই লইয়া যাই।

তাইলে বি কিচু দেয়ন লাগব না। এমনেই লইয়া যান, দেরে, তড়াতড়ি প্যাক কইরা। খান, আর একটা বিড়ি খান।

না না, বিড়ি আর খামু না। বেলা গেল, কি দিমু কন?

কইলাম ত আপনার মোন যা চায়। বিড়িডা বি ধরান না? অগত্যা বিড়ি ধরাতে বাধ্য হয় জাফর। সঙ্গী দু'জনও। পরস্পরের মধ্যে চলে ফিসফিসানি। দোকানী যেন শুনেও শোনে না। গেহু শেষ টান দিয়ে মুখ খোলে, চাইর টেকা দিমু জি, অয় ত দিয়া ছান।

এইডা কি আপনাগ বিচার অইল? না খাওয়াইয়া বি আমাগ মারবার চান?

আর কতা বাড়াইয়েন না। উচিত দামই কইচে গেহু। মেহেরবাণী কইরা দিয়া ছান জোতা জোড়া, জাফর উত্তর করে।

জাফরের কথায় দোকানীর গায়ে জ্বালা ধরে। ইচ্ছে ক'রে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দোকান থেকে বার ক'রে দেয়। তবু হাসতে হাসতেই কাকুতি জানায়, আর কিচু বাড়েন সাব। আপনাগ কথাও বি থাউক আমার কথাও বি থাউক। বনীর সময়ে আউটগ্যা টেকা ছান।

না, আর এক টেকাও দিবার পারুম না। ছান তো ঐ দামেই দিয়া ছান।

আর একটা টেকা বি ছান?

না না, আর একটা পয়সাও না।

আইচ্ছা, ছান তবে তাই-ই। দশদিনের গাহেক আপনারা— লক্ষী। আপনাগ ত আর ফিরাইয়া দিবার পারুম না। দেরে, ভাল কইরা প্যাক কইরা দে।

প্যাক করনের আবার কি কাম? এমনেই ছান না, সন্দিগ্ধ জাফর টাকা গুনে দিতে দিতে বাধা দেয়।

ইডা বি কি কন? কাচা বার্নিশ, ধুলা বালিতে নষ্ট অইয়া যাইব না? দোকানের বদনাম করুম নাকি? ছোট সাব্‌গ লেইগা আর দুই জোড়া বি দেই?

না না, অরা জোতা পরে না। টিকসই অইলে আমিই বরাবর আপনার দোকানে আহুম।

আলবৎ আইবেন। আশীব্বাদ করেন, আপনাগ দশজনের চরণ সেবা য্যান করবার পারি।

হে হে, কি যে কন। আহি তাইলে, আদাব, জুতোর বাক্স হাতে উঠে দাঁড়ায় জাফর।

দোকানী পাল্টা আদাব জানিয়ে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।

বেরিয়ে এসে গেদু উচ্ছ্বাস জানায়, দেখলেন নি মিঞা চোট্টাগ কারবার? অদ্দেকেরও কম দামে বেচল।

ওসমান সায় দেয়, জোতা জোড়া বেশ জিতাই অইচে। লন আগের শালার গালে দুই খান বারি মাইরা যাই।

কিন্তু জাফর কোন কথা বলে না। গলির মধ্যে ঢুকে বাক্স খুলে পরখ ক'রে দেখতে ব্যস্ত হয়।

তাজ্জব ব্যাপার! ওর মন যা বলেছিল ঠিক তাই হয়েছে।

সব শালা চোট্টা। এক পাটি জুতোই যে নেই বাক্সের মধ্যে।... রাগে দুঃখে নিজের মাথার চুলই ছিঁড়তে ইচ্ছে করে ওর। হায় হায় হায়, কি কুক্ষণে ও জুতো কিনতে বেরিয়েছে আজ!...

কাণ্ড দেখে চোখ মুখ গেদু ওসমানেরও শুকিয়ে যায়। এমন সাজানো গুছানো দোকান তা কিনা আসলে ঠগের আড্ডা। এক পাটি জুতো দিয়ে কি করবে ওরা? গেদু মরিয়া হয়েই ঘুরে দাঁড়ায়। গলার স্বর নরম ক'রেই জাফরকে সান্ত্বনা দেয়, চলেন, প্যাকার শালা অয়ত ভুলে এক পাটি দেয় নাই।

অগত্যা কি আর করা। তিনজনে আবার ফিরে আসে গ্র্যাণ্ড সু কোম্পানীতে। দোকানী যেন ওদের দেখেও দেখছে না। মৌজ ক'রে গড়গড়া টানছে। চোরের মতো চুপি চুপি উঠে এক কোণ ঘেঁষে দাঁড়ায় তিনজনে।

দোকানী গড়গড়া টানছে তো গড়গড়াই টানছে। আদর-আপ্যায়ন তো দূরের কথা চিনতেই যেন পারছে না।

ভয়ে ভয়ে গেহু মুখ খোলে, আদাব জি, আপনাগ একটা ভুল অইচে।

ভুল অইচে! কন কি হালায়! কি ভুল অইচে? হঠাৎ যেন মূর্ছা ভাঙে দোকানীর। বিস্ময়-ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে গেহুর দিকে।

. গেহু ঢোক গিলে বোঝাতে যায়, বাক্সের মদ্দে এক পাটি জোতা নাই জি।

দোকানী হোহো ক'রে হেসে ওঠে, তোবা তোবা তোবা। এই কথা! তা মিঞাজান, আট টেকা বি জোড়া অইলে চাইর টেকায় মাইনষে কউগ্যা জোতা দিব আপনারে?

চাইর টেকা জোড়া যে দাম অইল,—মুখ কাঁচুমাচু ক'রে উত্তর করে জাফর।

অরে আমার হৌরের পো-রে (শ্বশুরের পো), ইডা কি হালা গরুর হাট না—আট টেকার মাল চাইর টেকায় বিকাইব?

ধমক খেয়ে জাফর থ বনে যায়। অপমানে চোখ তুলতে পারে না।

কিন্তু গেহু দমে না। সাহসে নির্ভর ক'রেই বলে, ছাখেন জি, আপনার কতা মতোই উচিত দাম—

কথা শেষ করতে পারে না গেহু; দোকানী তেড়ে ওঠে, ওরে, আমার উচিত দেনেওলা। উচিত দাম দিবি ত ফ্যাল না বে দশ টেকা, দেখি কত মুরুদ? ঐ মৈফা, আমি বংশাল চললাম, ইসব আপদ দূর কর বে, বলতে বলতে গড়গড়ার নল নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায় দোকানী।

জাফর ফাঁপরে পড়ে। ও বোঝে, দোকানী সরে পড়ছে। এর পর আর কিছুই হবে না। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দু'হাত চেপে ধরে দোকানীর। কাঁদ কাঁদ স্বরেই বলে, দোহাই জি, আল্লার কসম, আর এক টেকা দেই, দিয়া ছান জোতা পাটি।

কি দিল্লাগী কর মিঞা? হিসাব মতো আর চাইর টেকা ছাও ত কও, নইলে বি সইরা পড়।

লজ্জায় অপমানে রাগে জাফরের ইচ্ছে করে শয়তানটাকে গলা

টিপে মেরে ফেলে নিজেও মরে। গেছ্ ওসমানের ওপরেই ফেটে পড়ে, তরাই ত আমারে ঠেকাইলি। কইচিলাম না, জোতা কিনা কাম নাই। এহন গুণা দিয়া মরি আমি। নেন জি, জোতা পাটি দিয়া ছান, গেছ্ ওসমানের ওপর ঝাল ঝেড়ে ফতুয়ার পকেট হাতড়ে আরও চার টাকা দোকানী দিকে ছুঁড়ে দেয় জাফর।

টাকা চারটে বাক্সে রেখে দোকানী সহকারীর দিকে ইঙ্গিত করে। সঙ্গে সঙ্গে আর-এক পাটি জুতো এনে হাজির করে সে। বাক্সের মধ্যে একত্রে প্যাক ক'রে দিতেই চায় সহকারী কিন্তু জাফর রাজী হয় না।

দোকানী খুশীর হাসি হেসে মন্তব্য করে। বাজারের সেরা মাল বি লইয়া গেলেন। পাঁচ বছর আর বি জোতা কিনন লাগব না। কিচু মনে কইরেন না, এক গেলাস ঠাণ্ডা ছরবৎ খান!

জাফর জুতো জোড়া হাতে করে বেরিয়ে যেতে যেতে উত্তর করে, আপনাগ ছরবৎ আপনারাই খান মিঞা। চইলা আয়রে,—একান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই সঙ্গীদের সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

দোকানী মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে।

পথ চলতে চলতে জাফরের মনে হয়, আর এক মুহূর্তও এই ঠগের আড্ডায় থাকবে না। শালা চার চারটে টাকা বোকা বানিয়ে নিয়ে নিলে। নিক শালা ওর গোরের কড়ি। আল্লার কাছে ঠেকবো শালা।...

সঙ্গীদের সঙ্গে জটলা করতে করতেই পথ চলতে থাকে জাফর। সহসা আবার হাঁক-ডাক শোনা যায়, আরে আহেন না বড় মিঞা, দেখি, কি চীজ বি গস্ত করলেন চোট্টার দোকানের থনে? আরে আহেন না বি একবার!

জাফর পাশ ফিরে দেখে 'মডার্ন স্যু কোম্পানীর' সেলস্‌ম্যান হাতছানিতে ডাকছে। তা মন্দ নয়, যাচাই ক'রে অন্তত দেখা যাবে কত টাকা ঠকালো শালা ঠগে।...

সেলস্‌ম্যানের ডাকে সোৎসাহেই ছুটে যায় মডার্ন স্যু কোম্পানীতে।

সেলস্‌ম্যান জাফরের হাত থেকে বাক্সটা টেনে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে প্রশ্ন করে, কত দিয়া আনলেন সাব এই পিস্‌বোডের ডেলা? চোট্টায় ত বি আপনারে জব্‌বর ঠকান ঠকাইচে? চোখ দিয়া বি চাইয়া দেখলেন না একবার?—বলতে বলতে সোলের ওপর তিনটা টোকা মারে।

প্রশ্ন শুনে জাফরের মুখ শুকিয়ে যায়। শালা ঠগ, টাকা ত লুটলই—জিনিসেও ঠকাইচে! হন্তদন্ত হয়েই সেলস্‌ম্যানকে পাল্টা প্রশ্ন করে, কত দাম অইব ইয়ার?

পিস্‌বোর্ডের আবার কি দাম সাব? টেকা দুই আড়াই!

দাঁড়িয়ে ছিল জাফর, উত্তর শুনে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে। ইচ্ছে করে নিজের গাল নিজে চড়ায়।

সেলস্‌ম্যান সুযোগ বুঝে আরও এক ডিগ্রী মাত্রা টানে, ঐ ক্যাঠা আছচ্‌রে, আমাগ এক লম্বর ডারবি একজোড়া ফেল ত? বেপারী সাব নিজের চক্ষেই একবার বি দেইখা যাউক, কি চীজ থুইয়া কি চীজ বি আনচে।

হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে দোকানের এক সহকারী এগারো নম্বর একজোড়া ডারবি এনে হাজির করে। সেলস্‌ম্যান নিজের পরনের লুঙ্গি দিয়ে বার কয়েক পুঁছে উচ্ছ্বাস জানায়, সাব, এই অইল বি আসল এক লম্বর কানপুরী ডারবি। ঝাড়া পাঁচ বচ্ছর বি পিনবেন। লোহার নাল বি বদলান লাগব্‌ তব বি ইয়ার গোঁড়ালির কিচু অইব না।—বলতে বলতে জাফরের কিনে আনা জুতোর সঙ্গে নিজের হাতের জুতো ঠুকতে থাকে।

সত্যি, এ জোড়া বোধহয় সরসই হবে ওর কিনে আনা জুতো থেকে। রং পালিশ কি উজ্জ্বল! মুখ দেখা যাচ্ছে।···মুগ্ধ হয়েই দাম জিজ্ঞেস করে জাফর। উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে দেখতে থাকে।

সেলস্‌ম্যান সুযোগ বুঝে আবার কোপ মারে, নেন ত বি খাঁটি কতা কইয়া দেই। পাঁউচ গ্যা টেকা দেয়ন লাগব। আরে, ছ্যাখেন কি? ছাগলের লগে বি গরুর তুলনা অয় নাকি? আসমান জমিন ফারাক।

তুলনায় জাফরেরও তাই মনে হয়। বিস্ময়ের সুরে পাল্টা প্রশ্ন করে, এক জোড়ার দাম কইলেন ত—না একখানের ?•

আপনার কথা শুইনা জোতা বি হাসবো। জোতা আবার একখান বিক্রি অয় নাকি ? জোড়ার দামই পাঁচ টেকা।

উত্তর শুনে জাফরের কাঁদতে ইচ্ছে করে। ডাহা ঠকান ঠকিয়েছে শালা ঠগ। কিন্তু একসঙ্গে হু'জোড়া জুতো দিয়ে করবে কি ও ? সেলস্‌ম্যানকে লক্ষ্য ক'রে অনুনয়ের সঙ্গেই জবাব দেয়, না জি, এখন আর নিবার পারুম না, টেকায় কুলাইব না। তবে জবান দিলাম, ইয়ার পর আপনার কাছেই আহুম।···

সেলস্‌ম্যান সে কথায় কান না দিয়ে পাল্টা অনুরোধ করে, আরে খুব পারবেন জি। আমরা বি মানুষ চিনি। মোন নরম কইরা লইয়া যান গা। ই দামে ই চীজ থাকব না।

না জি, ই ক্ষ্যাপে আর অইল না। সামনের ক্ষ্যাপে দেখা যাইব, নিজের কেনা জুতো হাতে উঠে দাঁড়ায় জাফর।

হাসতে হাসতে সেলস্‌ম্যান বলে, আইচ্ছা, তাই বি না অয় নিয়েন। তবে কল্‌তা বাজার থেইকা একগাছ লড়ি বি কিনা লইয়া যাইয়েন।

ক্যান, ই কতা কন যে !—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে জাফর।

কাচা চামড়ার জোতা কিনচেন, কুত্তা বি তাড়ান লাগব না ? হাসতে হাসতে গলে পড়ে সেলস্‌ম্যান।

জাফর অধিকতর বিস্মিত হয়, কাচা চামড়ার জোতা !

আইজ্ঞা হ্যাঁ জি। দিনকতক গেলেই মালুম বি পাইবেন। পায়ে ছাড়া হাতেও বি ঢুকব না। শুকাইয়া আমচুড়।

উঠে দাঁড়িয়েছিল জাফর, নৈরাশ্যে আবার বসে পড়ে।

সেলস্‌ম্যান ঝাঁ ক'রে জুতো জোড়া জাফরের হাত থেকে টেনে নিয়ে ওর নাকের ডগায় ধরে, হুইকা ছ্যাহেন, বদ্‌-বুতে অন্নপ্রাশনের ভাত বি প্যাটের থেইকা উইঠা আইব।

জাফর সঙ্কোচের সঙ্গেই ঘ্রাণ নেয়। কিন্তু তেমন কোন তুর্গন্ধ

টের পায় না। আমতা আমতা ক'রেই প্রতিবাদ করে, কই তেমুন ত কোন বদ্-বু নাই!

কন কি সাব! বদ্-বু নাই! আপনার বি সর্দির নাক মালুম পান না। বদ্-বুতে ত তিষ্ঠান দায়! হালায় কাচা শূয়রের চামড়া দিচে কিনা তাই বা কেঠা জানে!

তোবা তোবা কন কি! জাফর ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

সেলস্‌ম্যান দাঁও বুঝে আর-এক ধাপ এগিয়ে যায়, ঐ, কেঠা আছচ্‌রে, জলের বালতিডা একবার আন ত?

হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে জলপূর্ণ বালতি এনে হাজির করে সহকারী। সেলস্‌ম্যান বিন্দুমাত্র দ্বিধা না ক'রে ছ'পাটি জুতোই জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়।

জাফর গেহ্ একসঙ্গে চীৎকার ক'রে ওঠে, ইডা কি করলেন জি? জোতা জোড়ারে না এক্কেবারেই খাম করলেন।

আরে সাব, খাম আবার বি করুম কি? ইডা কি একটা সোল? রং কইরা বি পিস্‌বোর্ডই না চোট্টায় আপনাগ গচাইচে!

থাউক পিস্‌বোর্ড, আপনে ভিজাইলেন ক্যান? ই জোতা আমরা নিমু না।

আরে সাব্, আমিও ত বি তাই কই! পয়সা দিয়া মাটি কিনবেন নাকি? যান না, চোট্টার জোতা চোট্টার মুখের ওপর বি মাইরা আহেন। আমি না হয় আপনারে বি কিচু সুবিদা কইরাই দিমুনে।...

কি যে কন, ঐ হালা চামার দিব দাম ফেরত? জাফর প্রতিবাদ করে।

দিব না মানে? অর ঘাড় বি দিব—বাপ চৈদ্দ পুরুষ বি দিব। আপনে যান না, আমরা পাঁচজনে ত আচিই।

আমাগ দিয়া ওসব অইব না জি, আপনারেই ব্যবস্তা করন লাগব, গেহ্ উত্তর করে।

থুরি, ইডা বি কি কইলেন? আপনাগ চীজ আপনারা কিচু না কইলে আমরা কাউয়ায় (কাকে) কাউয়ার মাংস খামু নকি?

ওসব আমরা বুজি না জি, জোতা আপনে ভিজাইচেন আপনারেই খেসারৎ দেয়ন লাগব, দৃঢ় থেকেই প্রতিবাদ করে গেতু।

কৃত্রিম মুখ ভার ক'রে সেলস্‌ম্যান বলে, আপনাগ বি ভাল করবার যাইয়া এইডা যদি বিচার অয় তাইলে তাই বি দিমু।

দিমু না, আপনারে দেয়ন লাগবই, জাফর জোর ক'রে চেপে ধরে।

সেলস্‌ম্যান হাসতে হাসতে বলে, বেশ ত, কন না, বি কি দেয়ন লাগব ?

ভিজা জোতার বদলে হুকনা জোতা চাই আমরা।

বেশ, তাই লেন। এই নবাবী জোড়াই বি লইয়া যান,— নিজেদের ডারবি জোড়া দেখিয়ে ইঙ্গিত করে সেলস্‌ম্যান।

জাফর আশাতীত খুশী হয়। তা মন্দ হবে না। চার টাকা ঠকেছিল এখন কিছুটা উসুল হবে। এ জোড়া নিশ্চয় ও জোড়ার চেয়ে দামী। গদ্‌গদ হয়েই উচ্ছ্বাস জানায়, বেশ, তাই ছ্যান।

ঐ, দেরে ডারবি জোড়া প্যাক কইরা, সহকারীর উদ্দেশে আবার হাঁক ছাড়ে সেলস্‌ম্যান।

জাফর তাড়াতাড়ি বাধা দেয়, না না, প্যাক-পোক করন লাগব না, এমনেই ছ্যান।

আইচ্ছা, তাই বি লইয়া যান। ক্যাশ-মেমো করুম, না টেকা চাউরগ্যা এমনেই দিবেন ?

টেকা আবার কিসের ! জোতার বদলে জোতা দিবেন !

কন কি সাব ! আসমানের চান্দের লগে পোড়া রুটির বি ছাম করবার চান নাকি ? এক টেকা যে বাদ দিলাম তাই আমার গাঁইটের থেইকা যাইব। কেঠা নিব এই পিস্‌বোর্ডের ডেলা ?

পিস্‌বোর্ডের ডেলা আছে আমাগ আছে আপনি ভিজাইলেন ক্যান ? আমি আর এক পয়সাও দিবার পারুম না, দৃঢ় থেকেই প্রতিবাদ করে জাফর।

উত্তরে সেলস্‌ম্যান ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি টেনে টিপ্পনী কাটে, তাইলে বি সিদা রাস্তা ছ্যাহেন।

সিদা রাস্তা দেহুম মানে, আপনে আমার জোতা ভিজাইলেন ক্যান ?

মর ব্যাটা মাম্‌দার পো, যাচাই করবার আইচিলা কিয়ের লেইগা ? না ভিজাইলে কি তোমার মাথা হুইঙ্গা ঠিক করুম, কাচা না পাকা চামড়া ?—সেলস্‌ম্যান জাফরের দিকে চেয়ে এক ডিগ্রী বেশী গলা চড়িয়ে গর্জে উঠে।

জাফর থ বনে যায়। ভাবতেও পারে নি ছোটলোকটা এমনি ক'রে মুখখিস্তি করবে। না, ও-ও ছাড়বে না। যা থাকে বরাতে উচিত শিক্ষাই দেবে পাজীটাকে। জাফরও সমস্বরেই পাল্টা গর্জে ওঠে, এই মিঞা, মুখ সামলাইয়া কথা কইও। মুখ ভাইঙ্গা ফালামু, বলতে বলতে ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে যায়।

অরে আমার মাউগের ভাইরে, হালার লগে বলে আবার মুখ সামলাইয়া কথা কয়ন লাগব ! ঐ, ডাকত রে বাচ্চুরে, চাষার পোরে ভাল কইরা কিচু ঢাকাই খানা খাওয়াইয়া দেই।—জাফরের আওতা থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়ে তর্জন-গর্জন শুরু করে সেলস্‌ম্যান।

কিন্তু জাফর ও-সবে ভয় পায় না। ঘুমন্ত বাঘ জেগে উঠেছে। সজোরেই আবার গর্জে ওঠে, ডাক শালা তর বাপ চৌদ্দ পুরুষরে, দেখি কেঠা কারে খানা খাওয়ায় ?

জাফর ভয় না পেলেও গেহু ভড়কে যায় ! ও জানে, জাফরের যত কেরামতিই থাক বিদেশে শেষ পর্যন্ত ওদের অপদস্থই হতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে জাফরের হাত চেপে ধরে। সেলস্‌ম্যানের উদ্দেশে অনুনয় জানায়, আপনেও কি খেপ্‌লেন নাকি জি ?

সেলস্‌ম্যান রীতিমতো ভয়ই পেয়েছে। তাই গেহুর মধ্যস্থতায় মান বাঁচাবার ফুরসত পেয়ে নরম সুরেই উত্তর করে, আমার কি কসুর দেখলেন ? উনিই ত বি আগে মেজাজ খারাপ করল।

জাফরের মেজাজ সত্যি সত্যি পঞ্চমে উঠেছে। গেহুর কথায় কোনরকম সাড়া না দিয়ে ঝাঁজের সঙ্গেই চীৎকার করতে থাকে, আমি কোন কতা হুনব না, আমার হুকনা জোতা চাই।

উত্তরে সেলস্ম্যান আবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠতেই যাচ্ছিল কিন্তু গেহু ওকে সে সুযোগ দেয় না। জাফরকেই ধমক দেয়, হুকনা জোতা চাই, পাইবেন, তার লেইগা চীৎকার করবার কি আচে ?

ধমক খেয়ে জাফর কিছুটা শান্ত হয়। রাগে সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে।

গেহু সেলস্ম্যানকে লক্ষ্য ক'রে অনুরোধ করে, হ্যাখেন বেপারী-সাব, যদি আমার কথা রাখেন ত একটা কথা কইবার চাই।

সেলস্ম্যান এই রকম একটা সুযোগই খুঁজছিল, তাড়াতাড়ি সায় দেয়, কন, কি কইবার চান আপনে ?

হ্যাহেন, আপনেও ব্যবসা করেন আমরাও ব্যবসা করি। ঝগড়া-ঝাঁটির কাম নাই। আমাগ জোড়া ছাড়া আর হুই টেকা দিমু আপনারে—আপনার জোড়া দিয়া হ্যান।

সেলস্ম্যানের কিছু বলার আগে জাফর চেঁচিয়ে ওঠে, না না, আমি আর একটা পয়সাও দিমু না। ও সব ভাল মাইন্‌ষিতে কাম নাই।

গেহু আবার ধমক দেয় জাফরকে, আপনে চুপ করেন, আপনারে আমি কিচু জিগাই নাই। আপনে না দ্যান আমি দিমু। বেপারী সাব, দ্যান জোতা জোড়া দিয়া। যা অইবার তা ত অইচেই।

আর কিচু বাড়েন। আইচ্ছা, আপনার কথাও বি থাউক আমার কথাও বি থাউক। আর এউগ্যা টেকা বাড়েন।

না না, আর কিচু দিবার পারুম না। মেহেরবানি করেন, দেখচেন ত, আমারই গচ্চা যাইব।

বনীর সময়, কি দিগ্‌দারীতেই না বি ফালাইলেন আপনে ! দশ দিনের গাহেক আপনারা—লক্ষ্মী। আপনাগ ত আর না করবার পরুম না। হ্যান আপনার যা মোন চায়।···

গেহু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। নিজের ট্যাঁক থেকেই নগদ হু'টাকা বার ক'রে দেয়।

সেলস্ম্যান টাকা হুটো তিনবার কপালে ছুঁইয়ে বাক্সে রাখে। সহকারীকে হুকুম করে জুতো-জোড়া বেঁধে দিতে।

গেছ্ সে সুযোগ আর দেয় না। খোলা অবস্থাতেই জুতো জোড়া হাতে ক'রে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে।

ওসমান জাফরও নীরবেই ওকে অনুসরণ করে। জাফর বোধ হয় শেষ পর্যন্ত খুশীই হয়। জুতো জোড়া খুব পছন্দ ওর।

ওরা তিনজন দোকান থেকে নেমে এলে সেলস্ম্যান সহকারীকে লক্ষ্য ক'রে শুধোয়, কারবার বি কেমুন অইলরে মৈফা ?

মফিউদ্দীন হি হি ক'রে হাসতে হাসতে জবাব দেয়, কারবার বি ত চুটিয়েই করলেন জি। পাকা চামড়ার জোতা বি রাইখা কাচা চামড়ার জোতা বি গচাইলেন।

সেলস্ম্যান সুরে সুর মিলিয়ে সায় দেয়, সঙ্গে ফাউ বি নগদ দুইখান টেকা, আবে, সেটাও বি একবার ক'।...

ঢুলি বিদায়

উমাকিশোরের ছেলের বিয়ে—একমাত্র ছেলের। আজ হলুদ কোটা, পরশু বিয়ে। এয়োদের সকলেই জানে, ঢোল কাঁসর কিছুই বাজবে না এ বাড়িতে। কোনদিন বাজে নি। শুধু উলু দিয়েই কাজ সারতে হবে।...হতোও ঠিক তাই। কিন্তু উমাকিশোর এ যাত্রা বেপরোয়া। সত্যি বটে, ওল্লার পেট টিপে গুড় বার করে ও। ভিখিরী বোষ্টম বাড়িতে পা দিলে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়। শেষ বাজারের হাজা-মজা শাক-সবজি এনে সংসার চালায়। তবু এ-ক্ষেত্রে ও কিছুতেই কৃপণতা করতে পারবে না। দরাজ হাতেই খরচ ক'রে সারা জীবনের কলঙ্ক ঘোচাবে। উমাকিশোর যথাসময়ে যথারীতি ঢোল কাঁসর বায়না ক'রে আসে। শুধু ঢোল কাঁসরই নয় সঙ্গে সানাইও। পাড়ার কেউ কোনদিন যা করে নি ও তাই করে। কেন করবে না ?—মা লক্ষ্মী দু'হাতে যা দিয়েছেন নন্দ বসে খেলেও তা ফুরোবে না। তা'ছাড়া ওর মার শখ-আহ্লাদটার দিকেও নজর দেওয়া দরকার। সারাজীবন বেচারা গঞ্জনা সয়ে এসেছে। ছুঁড়ী বুড়ী ঘাটে পথে যখন যে পেরেছে খোঁটা দিয়ে পোঁটা বার করেছে। এই তো ওর শেষ সুযোগ।...না, শুধু ঢোল সানাই-ই বাজবে না, সঙ্গে পাঁচ মিঠাইয়ের ফলারও খাওয়াবে। যার যেমন খুশি পেট ভরে খাবে।...উমাকিশোর দরাজ দিলেই হাট-বাজার শুরু করে।

হলুদ কোটার সময় ভোর সাতটায়। ঢোল সানাই কাঁসর-ওয়ালারা আসছে সাড়ে ছ'টায়। উমাকিশোর গিন্নী এয়োদের তাগিদ দিয়ে সব কিছু গোছগাছ ক'রে অপেক্ষায় থাকে। আগে বাড়িতে বাজনা বাজবে পরে হলুদে পাড় পড়বে।

বেশ, তাই হবে, এয়োদের দলনেত্রী এক খিলি পান মুখে পুরে সইদিদির দিকে চোখ ইশারা করেন।

সইদিদিও আর-এক খিলি পান মুখে দিয়ে মন্তব্য করেন, তুই ক্ষেপেছিস্ লা, এই বাড়িতে বাজবে বাজনা ? পয়সার শোকে ন'কর্তার কলজে ফেটে দু'ফাঁক হয়ে যাবে না ?

যা বলেছিস দিদি। পানের খিলির নমুনা দেখেই তা বুঝতে পারছি ! এর নাম খিলি পান ? পেটে না গিয়ে দাঁতের ফাঁকেই না থাকবে ! দলনেত্রী উত্তর দেবার আগে চপুর মা উত্তর করে। এয়োদের আর একজন।

কথার মতো কথা পেয়ে সইদিদি জের টানে, তুই ঠিক বলেছিস দিদি ! ছেলের বিয়ের পান বোধহয় ন'কর্তা বাজার ঝাঁট দিয়ে এনেছে।···

চুপ, চুপ কর তোরা ! ঐ ন' গিন্নী আসছে, শুনবে, দলনেত্রী ধমক দেয়।

কিন্তু চপুর মা দমে না। ঠোঁট উল্টিয়েই জবাব দেয়, আসে আসুক, আমি কারো তোয়াক্কা করি না। উচিত কথা বলব তাতে আবার ভয়-ডর কিসের ?

নন্দর মা শুনেও যেন কিছু শোনে না। কি বলবে বেচারা ? মিনসে তো ধোঁকাই দিয়েছে, নয় তো বায়না করলে কখনো ঢোল সানাই না আসে ?

কাঁদ কাঁদ হয়েই দলনেত্রীর কাছে এসে প্রস্তাব করে, সাতটা বাজে দিদি, উলু দিয়েই কাজ শুরু কর। কি করব, সবই আমার কপাল ! বায়নার টাকা নিয়েও তো মুখপোড়ারা সময়মতো এল না।···

তা আর জানি না দিদি ! তোমার কর্তা কি সেই মানুষ, বায়না ছাড়া কথা বলবেন ? মুখপোড়ারা এর পরে এলে ঝাঁটা মেরে বিদায় করে দিও। নে ল, তোরা সব ওঠ, সকলকে তাড়া দিয়ে নিজেও উঠে দাঁড়ায় দলনেত্রী।

নন্দর মা কাজের তাড়ায় পেছন ফিরলে সকলে মিলে হেসে খুন হয়। এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে।···

নন্দর মা দেখেও যেন কিছুই দেখে না। মনের রাগে উমা-কিশোরকে গিয়েই আর-এক হাত নেয়।…

উমাকিশোর বেকুব বনে। কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। ভগবান বোধহয় চান না ওর বদনাম ঘোচে। না, বাড়িতে আর থাকার জো নেই। রাস্তায় বেরিয়ে পায়চারি করতে থাকে ন'কর্তা। উৎকণ্ঠায় প্রহর গুণতে থাকে। হলুদ কোটা প্রায় শেষ হয় হয় বাঁকের মোড়ে বাজনাওয়ালাদের দেখা যায়। উমাকিশোরের ইচ্ছে হয়, বেটাদের দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু না, এখন তাড়িয়ে দিলে দুর্নাম বই সুনাম হবে না। ঝামেলা চুকে যাক, বিদায় নেবার সময় কষানি বার করা যাবে।…

বাজনাওয়ালারা নিকটে এসে অভিবাদন জানালে দাঁত কটমট ক'রে এক ঝলক তাকায় মাত্র উমাকিশোর। মুখ আর খোলে না।

নিজেদের ত্রুটি বুঝতে পারে বাজনাওয়ালারা। তাই আর কোন কথা না বাড়িয়ে কর্তাকে খুশী করবার উদ্দেশ্যে পর পর তিনখানা গৎ বাজিয়ে যায়। ন'কর্তা সত্যি খুশী হয়। পাড়া প্রতিবেশী সকলেই। সানাইওয়ালা জাদু জানে। চপুর মা, সইদিদি অবাক হয়েই গালে হাত দেয়। বাজনা যখন সত্যি এল তখন পাকা ফলারও বাদ যাবে না নিশ্চয়। ন' গিন্নীকে এবার তোয়াজ করতে লেগে যায় সকলে। নন্দর বিয়ে নয় তো যেন ওদের নিজের ছেলের বিয়ে।…

পাড়ার মোড়লরাও বাদ যায় না। উমাকিশোরকে দেখে এ পর্যন্ত যারা টিকা-টিপ্পনী কেটেছে তারা গায়ে পড়ে এসে আন্তরিকতা জানায়। খাটা-খাটুনীতে কোনরকম সাহায্যের দরকার থাকলে ওরা প্রস্তুত।

উমাকিশোর সবই বোঝে। বুঝেই সকলকে পান তামাক দিয়ে খাতির করে। যেটুকু প্রয়োজন সাহায্য চায়।

বাড়িতে ভিয়েন বসবে। আনুসঙ্গিক সমস্ত কেনা-কাটার ভার নন্দর বড় মামার ওপর। দাশ এস্টেটের ম্যানেজার রমানাথ। করিতকর্মা মানুষ। এ সব কাজে রপ্ত। ন' গিন্নী নিজে দাদাকে

পত্র দেয়। কালাচাঁদ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কারিগররাই যেন আসে। ঘি, চিনি, ময়দা সবই অতি উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। গাঁয়ের সকল মানুষকে পেট ভরে লালমোহন আর অমৃতি খাওয়াতে হবে। সঙ্গে ডাল, ডালনা, কপির তরকারি। চিঠিতে ছেদ টেনে সই করতে যায়, আবার আর-এক কথা মনে পড়ে। পুনশ্চ দিয়ে শুরু করে আবার, যেভাবেই হোক সরকারী ব্যাণ্ড পার্টি ঠিক করা চাই-ই। হাউই, রংমশাল, বোম পট্কাও যেন ভাল দেখে আনা হয়।...

উমাকিশোর গিন্নীর গিন্নীপনায় নাক গলায় না। সিন্দুক আজ ও আলবৎ খুলে দেবে, ওর যা মনে চায় করুক।

উমাকিশোর সায়ই দেয়। কিন্তু দাদা রমানাথ অতখানি দিলদরিয়া হতে পারে না। ভগ্নীপতিকে বিলক্ষণ চেনে সে। তাই হিসেব মতোই কাজ করে। আজকাল আবার ঘি খায় কে? সকলেই তো বনস্পতি পছন্দ করে। সুন্দর তক্‌তকে জিনিস। কোন অবস্থাতেই অম্বল হয় না। সস্তা দামে স্বাস্থ্য-সম্মত খাবার। ঘিয়ের বদলে বড় হু'টিন বনস্পতিই কিনে ফেলে রমানাথ। কালাচাঁদের দোকানের ধারে-কাছেও যায় না। রাঁধুনির সেরা উৎকলবাসী। হু'জন উড়ে ঠাকুরের সঙ্গেই পাকাপাকি করে। ব্যাণ্ড পার্টি আতস বাজীর কোন দরকারই নেই। অনর্থক বাজে ব্যয়।...হলুদ কোটার পরের দিন হিসেব মতো জিনিস-পত্র নিয়ে হাজির হয় রমানাথ। ইচ্ছা, নিজেই ভাঁড়ার আগলাবে।

গ্রামসুদ্ধ লোকের বৌ-ভাতের নেমন্তন্ন। স্ত্রী-পুরুষ অতিথি অভ্যাগত সকলের। গাঁয়ের লোক খুশীতে ডগমগ। বলতে গেলে তিনদিন আধ-পেটা খেয়ে আছে সকলে। চন্‌চনে খিদে না হলে জুতসই হবে না। ঢাকার লালামোহন জগৎ বিখ্যাত। আর কিছু না থাক— লালমোহন দিয়েই পেট ভরাবে। আশায় আনন্দে প্রহর গুণতে থাকে।

বেশী দিন উৎকণ্ঠায় থাকতে হয় না। বিয়ের পরের পরের দিনই

পাত পড়ে। প্রথম বৈঠকে বসে কন্যাপক্ষের যাত্রীরা। সঙ্গে গাঁয়ের মোড়ল ও ছেলেপুলেরা। পরিবেশন শুরু হয়। তদারককারী স্বয়ং রমানাথ। নুন লঙ্কা পরিবেশনের পর প্রত্যেকের পাতে একখানা ক'রে গরম গরম বেগুন ভাজা পড়ে। সঙ্গে অল্প পরিমাণ শাক ভাজা। শাক ভাজার পরে আসে ঝুড়ি ভর্তি পুরী। নিমন্ত্রিতেরা লুচির জন্যই তৈরী ছিল। পুরী দেখে কিছুটা ঘাবড়ে যায়। কিন্তু খিদের সময়, বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে না। নুন লঙ্কা বেগুন ভাজা দিয়েই শুরু করে।

সমাজপতি হাজারিলাল একটা পুরী ছিঁড়ে মুখে দিয়েই রমানাথের উদ্দেশে খেঁকিয়ে ওঠে, ইডা কি করচেন বিয়াই! নুচি করবার পারলেন না?

নুচি! ইয়ার কাচে বি নুচি লাগে নাকি? এক লম্বর চন্দৌসী আটার পুরী। ভাল কইরা বি দাঁতে ফালাইয়া খান না, মজা পাইবেন নে, রমানাথ গদ্‌গদ হয়েই উত্তর দেয়।

হ', যা জোতার সুখতলা করচেন তাতে দাঁত দিয়া চাবাইয়া খাওয়নই লাগব। ইয়া আমি খাইবার পারুম না। পরে কি আচে আনেন, হাজারিলাল বিরক্তির সঙ্গেই পাল্টা জবাব দেয়।

কিন্তু রমানাথ দমে না। ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে রসিকতা করে, বুচ্চি, লালমোহন ছাড়া বি দাঁতে কিচু ঠেকাইবেন না।

আরে রাখেন মশয় আপনার ঢলাইনা কথা! ইয়ার নাম পুরী! পুরী আমরা কোনদিন খাই নাই? থু থু থু থু থু, হাজারিলালের পাশে বসে বিরোধিলাল খাচ্ছিল। মুখ থেকে সব কিছু ফেলে দিয়ে বিকট চীৎকার ক'রে ওঠে।

রমানাথের হাসি বন্ধ হয়ে যায়। বিস্মিতভাবেই বিরোধিলালকে প্রশ্ন করে, কি হইল বি রায় মশয়?

হইচে আমার মাথা আর আপনার মুণ্ডু। খিদার সময় মাইনষের লগে মস্‌করা করনের কি কাম আছিল? ময়ান ত দেনই নাই তাতে আবার তিতা বিষ।

তিতা! কন কি?

খালি তিতা! ভোমরা গন্দে উটকি আহে। কোথার থনে আনচেন এই বস্তা পচা আটা?

কি বাজে কথা কন রায় মশয়? চুপ কইরা বইহা খান না বি? —রমানাথ ঝাঁজিয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রত্যুত্তর আর বিরোধিলালকে দিতে হয় না। পাশ থেকে মদন আর গোষ্ঠ পুরী হাতে তেড়ে ওঠে, বাজে কথা আপনার লগে কি কইব মশয়? বিশ্বাস না হয় চাইখা ছাখেন না,—বলতে বলতে পারে তো এঁটো পুরী রমানাথের মুখের মধ্যে গুঁজে দেয়।

কন্যাপক্ষ ছাড়া বৈঠকের আর সকলেই মদন আর গোষ্ঠর দেখাদেখি উঠে দাঁড়ায়। বিরোধিলাল তো হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বৈঠক ছেড়ে চলে যেতেই উদ্যত হয়।

উমাকিশোর ফাঁপরে পড়ে। কি করবে ভেবে পায় না। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দু'হাত দিয়ে বিরোধির হাত চেপে ধরে। একান্ত বিনয়ের সঙ্গেই কাকুতি জানায়, দোহাই ভাই, রাগ করবেন না। পুরী না খান দই মিষ্টি যা খুশি খান। আমাকে ক্ষমা করেন···

কিন্তু বিরোধি তবু গোঁ ছাড়ে না।

অবশেষে সমাজপতি হাজারিলাল কোনরকমে তাল সামলায়।

উত্তেজনা কমলে ডাল, ডালনা, কপির তরকারি পাতে পড়ে।

ডাল মুখে দিয়ে হাজারি নিজেই আঁতকে ওঠে। আস্ত একখানি নুনের জাহাজই বোধ হয় ডালের গামলায় ডুবেছে। কার সাধ্যি মুখে দেয়। কপির তরকারি পোড়া গন্ধে বিস্বাদ।

বৈঠকে আবার গুঞ্জরন ওঠে। কিন্তু হাজারি এবার আর কাউকে হইচই করতে দেয় না। নিজেই উদ্যোগী হয়ে এসব বাদ দিয়ে মিষ্টি দেখাবার হুকুম করে।

রমানাথ গা ঢাকা দেয়। উমাকিশোর নিজে পেতলের বালতি ভর্তি লালমোহন এনে পরিবেশন শুরু করে। প্রথমেই সমাজপতির পাতে একসঙ্গে চারটে লালমোহন ফেলে দেয়।

হাজারিলাল মৌখিক আপত্তি জানাতে গিয়েও সুযোগ পায় না। রসনা জলে টৈটুম্বুর। তাড়াতাড়ি সেটা ভেঙে মুখে দিতে যায়। কিন্তু একি লালমোহনরে বাবা! হাতের টানে দিব্যি রবারের মতো বড় হচ্ছে! ভাঙতে না পেরে আস্ত একটা লালমোহনই মুখে পুরে চিবুতে যায়। উঃ, কি দুর্গন্ধ! হাজারিলাল আর ধৈর্য রাখতে পারে না। মুখ থেকে গোটা লালমোহন বার ক'রে সোজা উমাকিশোরের নাকের ডগায় ছুঁড়ে মারে। আর যাবে কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকের ছেলে-ছোকরারা তেড়ে এসে বালতিসুদ্ধ লালমোহন উমাকিশোরের মাথায় ঢেলে দিয়ে খিস্তি-খেউড় করতে করতে ছুটে পালায়।

ভাঁড়ারে যেন দক্ষযজ্ঞই হয়ে গেলো। খাবার মতো কোন জিনিসই বাঁচে নি। ক্ষোভে দুঃখে উমাকিশোর অনেকক্ষণ ধরে বুক চাপড়ে কাঁদে। এমন অপমানও ওর কপালে লেখা ছিল?...ওকে তো সকলেই যেমন খুশি বকে গেলো। কিন্তু ও কাকে কি বলে? ও তো সত্যি সত্যিই ভাল খাওয়াতে চেয়েছিল।...

উমাকিশোরের রাগ গিয়ে পড়ে রমানাথের ওপর। কিন্তু কোথায় পায় রমানাথকে? ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে সে তো অনেকটা এগিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর উমাকিশোর আপন মনেই উঠে ঘাটে যায়। আপাদমস্তক ধুয়ে পুঁছে অনেকটা হালকা হয়। মাথা নীচু ক'রে ঘরে ফেরে। বড় বাঁচা বাঁচে হাজারিলালের হাতে-পায়ে ধরে। সমাজের লোক একঘরে করতেই চেয়েছিল, হাজারিলাল বলে কয়ে ঠেকা দেয়। পরের দিন পেট ভরে সকলকে মাছ-ভাত খাইয়ে মুক্তি পায়।

বিয়ের ঝামেলা একে একে সবই চুকে যায়। বাকী শুধু বিদায় আদায়। হিসেবের খাতা দেখে আঁতকে ওঠে উমাকিশোর। খাওয়া-দাওয়ায় দোকর খরচা হওয়ায় হিসেবের অঙ্ক বাঘে খেয়েছে। নাজেহালটাই কি কম হতে হয়েছে? এর জন্য দায়ী ঐ শালা ঢোল সানাইওয়ালা। ওরাই শুভকাজের আগে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। হ্যাঁ, এত সব অনর্থের জন্য ওরাই দায়ী। আসুক শালারা

বিদায় নিতে···উমাকিশোরের রাগ গিয়ে পড়ে বাজনাদারদের ওপর।

সিন্দুক থেকে টাকা বার করতে পাঁজরার এক একখানা হাড় খুলে যাবার উপক্রম হলেও ব্রাহ্মণ বিদায়, মালী বিদায়, নাপিত বিদায় নিয়ম মতোই ক'রে যায় উমাকিশোর। বাজারের অন্যান্য দায়-দেনাও চোখ-কান বুজে মিটিয়ে দেয়। শুধু অপেক্ষায় থাকে ঢুলি, কাঁসর ও সানাইওয়ালার জন্য।

ওদের তিনজনের হয়ে ঢুলিওয়ালা একাই আসে। কেননা, সে-ই বাকী দু'জনকে ঠিক করেছে। সব ঝামেলা মিটে গেলে ঢুলিওয়ালা হাতজোড় ক'রে এসে দাঁড়ায়। উমাকিশোর সুদের অঙ্ক কষছিল, দেখেও দেখে না।

পেন্নাম হই কত্তা, ঢুলিওয়ালা নিজের আগমন বার্তা ঘোষণা করে।

উমাকিশোর এক ঝলক চোখ তুলে পাশ কাটায়, এখন সময় নেই, পরে আসিস।

মুখ চোখের ভাব দেখে দাঁড়াতে সাহস করে না ঢুলিওয়ালা। সেদিনের মতো বিদায় হয়। পরের দিন আবার আসে।

কিন্তু উমাকিশোরের সেই একই ভাব। চোখ মেলে তাকায় না পর্যন্ত।

ঢুলিওয়ালা পেন্নাম ঠুকে কাকুতি জানায়, আইজ্ঞা কত্তা, আমার বিদায়টা ?

উমাকিশোর মুখ তুলে তাকায় এবার। এক ঝলক দৃষ্টি ক্ষেপ ক'রে আবার হিসেবের খাতায় চোখ নামিয়ে দেয়। অন্যমনস্ক থেকেই বলে, উত্তম কথা—হবে। কত পাওনা তোর ?

আইজ্ঞা, তিন তিরিক্ষে নয় টেকা দিবার চাইচিলেন। এলা বকশিশ যা দ্যান।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বকশিশ ত পাবিই, আগে পাওনাটাই নে।

আইজ্ঞা আপনার একমাত্র ছেইলার বিয়াতে বাজাইচি—তিন জনকে তিনখান কাপড় ত দিবেনই, খুশীতে আটখানা হয় ঢুলিওয়ালা।

উমাকিশোর ততোধিক খুশী হয়ে উত্তর করে, নিশ্চয়—নিশ্চয় তা আর দেব না। হ্যাঁ, কত টাকায় যেন বায়না করেছিলাম ?

আইজ্ঞা, ঐ নয় টেকায়।

বায়না বাবদ নিয়েছিস কত ?

আইজ্ঞা, তিন টেকা।

তাহলে পাবি আর কত ?

আইজ্ঞা, ছয় টেকা।

উত্তম কথা। কিন্তু আসবার কথা ছিল ক'টায় ?

আইজ্ঞা ভোর সাড়ে ছয়টায়।

এসেছিস ক'টায় ?

আইজ্ঞা, সাড়ে সাতটায়।

তাহলে তার দরুন জরিমানা দু' টাকা।

আইজ্ঞা, কন কি !

হ্যাঁ হ্যাঁ বেটা, ঠিকই কই। অঙ্ক কষে দেখলে এর বেশীই হয়। আর তোরা যে বাজিয়েছিস—মাঝে মাঝে তার তাল কেটে গেছে। তার দরুন জরিমানা পাঁচ টাকা। আর তোদের ঢোলটা ছিল ঢ্যাব-ঢ্যাবা। তার দরুন জরিমানা আরও পাঁচ টাকা। তাহলে তোদের পাওনা হলো মোট ছ' টাকা। আর এদিকে জরিমানা হলো বার টাকা। এখন বাকী ছ' টাকা ফ্যাল তো ফ্যাল নয় তো ঢোল পাবি না,···উমাকিশোর এক লাফে ছুটে এসে দু'হাতে ঢোল জড়িয়ে ধরে।

ঢোলওয়ালা বকশিশের স্বপ্ন দেখছিল উমাকিশোরের কাণ্ড দেখে ফাঁপরে পড়ে। সজোরে ঢোল ধরে টানতে টানতে চেঁচাতে থাকে, ইডা কি কন কত্তা ? দশ জায়গায় কাজ আমাগ, সময়ের একটু ইদিক ওদিক অইবই। দশ জায়গায়ই অয়। কিন্তু কেউ ত আপনার মতন জরিমানা করে না। তাল আবার কিসের কাটব, আর নতুন ঢোলইবা ঢ্যাব-ঢ্যাবা অইব ক্যান ? আঃ, ঢোল ছাড়েন।

ইস্, কোথাকার সাউকার রে আমার ! দেরি হবেই ! দেরি

হবে তো জরিমানা আলবৎ দিবি। ফ্যাল বেটা ছ' টাকা নয় তো কিছুতেই ঢোল পাবি না।

ভাল অইব না, ঢোল ছাড়েন মশয়, নাইলে আমি পাঁচজনরে ডাকুম।

ডাক শালা তোর কোন বাবারে ডাকবি? টাকা না দিলে কিছুতেই ঢোল পাবি না।

ঢুলিতে আর উমাকিশোরেতে সমানে টানাটানি চলে।

নন্দর বউ শ্বশুরের জন্য পান সেজে দিতে আসছিল। দু'জনের কাণ্ড দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘোমটার আড়ালে ফিক ফিক ক'রে হাসতে থাকে নতুন বৌ।

কিন্তু উমাকিশোরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ঢোল ধরে টানছে তো টানছেই।

সাফাই সাক্ষী

হাজার টাকার লগ্নি লালমোহনের—সুদে আসলে ষোল শ'তে দাঁড়িয়েছে। খাতক জব্বর নিশ্চিন্ত। কোন পাত্তাই দেয় না সে। দেয় না ঠিক নয় দেবার উপায়ই নেই। হাল গরু বেচেও এত টাকা হবে না। ঘরদোর জমি-জিরেত বেচলে হয়তো কোনরকমে হয়ে যায়। কিন্তু সব বেচে কর্জ শোধ দিলে খাবে কি? ছেলে-বুড়োয় মিলে তো দশ বারো জনের সংসার। মাসে কম ক'রেও চৌদ্দ পনেরো মন চাল চাই।...

লালমোহনও নাচার। আসল না হোক সুদ তার চাই-ই। সুদ থেকেই খাওয়া-পরা বাড়-বাড়ন্ত। লালমোহন বলে, জব্বর, আসল না দিলি সুদটা বে দিয়ে দে।

উত্তরে জব্বর বলে, না মালিক, সুদ-উদ বি কিচু অইব না। যা দিন-কাল পড়চে, আসল থেইকা বাদ ছ্যান ত বি কিচু দেই।

লালমোহন রাজী নয়। সুদ ছাড়লে খাবে কি ও? দিন কতক দম ধরে থাকে লালমোহন। তার পর আবার হাঁটাহাঁটি শুরু করে। একরকম হাতে ধরেই অনুরোধ করে জব্বরকে। কিন্তু জব্বরের সেই একই কথা, কিছু দিতে পারবে না সে। আসল দেওয়াও তার পক্ষে এখন আর সম্ভবপর নয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেই আদালতে আর্জি পেশ করে লালমোহন। জান আর মানের দায়েই করে। উকিল বনবিহারী বসু আশ্বাস দেন, সম্পত্তি যখন রয়েছে তখন না দিয়ে যাবে কোথায় বাছাধন! সুদ আসল দুই-ই আসবে—সঙ্গে কিছু ফাউ।

আশ্বাস পেয়ে লালমোহন খুশী হয়—সোনালী স্বপ্ন দেখে। বেনামীতে নিলামটা ডেকে নিতে পারলে ষোল শ'র জায়গায় বিশ শ' আটকায় কে?

জব্বরের উকিলও জব্বরকে জবর মতলব দিয়েছে। আদালতের সমন যেতেই সাফ জবাব দেয়, টাকা সে কারো কাছে ধারে না। দলিল জাল।

দলিল জাল! বলে কি নিমকহারাম। নিজের হাতে করকরে নোট গুণে নিয়ে টিপসই দিলে আর এখন বলছে জাল! ওরে বজ্জাত, তুই জাল বললেই জাল হবে? সাক্ষী-সাবুদ নেই? পরীক্ষায় তোর আঙুলের ছাপ ধরা পড়বে না? আমাকে না হয় কিছুটা জ্বালাবি—কিছু খসাবি!...জব্বরের জবাবের নকল পেয়ে ক্ষেপে ওঠে লালমোহন। একাই বসে বসে তিন কলকে তামাক সাবড়ে দেয়। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মগজের নতুন দোর-জানালা খুলে যায়। না না, রেগে-মেগে কিছু হবে না। কৌশলে বেটাকে বশে আনাই বুদ্ধিমানের কাজ। বিশেষজ্ঞ দিয়ে টিপসই পরীক্ষা করাতে গেলে তো একগাদা টাকা খসবে। ডিক্রি অবশ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু বেটার আছে কি? আসলেই যে ফাঁক।...মালিক লালমোহন দূত পাঠায়। তাড়া খেয়ে দূত ফিরে এলে খাড়া পায়ে নিজে গিয়ে তোষামোদ শুরু করে।

কিন্তু জব্বর মিঞা জবর কলজে নিয়ে সাফ জবাবই দেয়। না মশয়, তোমার লগে বুঝ পরখ বি আদালতে করুম। ওসব আপোষ-ওপোষ বি অইব না।...

হবে না-ই যখন তখন লালমোহনও ছেড়ে কথা কয় না। স্পষ্টই শুনিয়ে দেয়, আইচ্ছা মিঞা, তাই বি অইব। আদালতের শখ বি মিটাইয়া দিমু তোমার। বাড়িতে ঘুঘু চড়ামু তবে বি আমার নাম লালমোহন বণিক্য।

যাও যাও মশয়, আমারে বি ঘুঘু দেখাইবার আইহ না। ফাঁদ বি পাতচি ঘাঁনি ঘুরাইবার লেইগা—

আইচ্ছা মিঞা, দেহা যাইব কেঠা কারে ঘাঁনি ঘুরায়, মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে লালমোহন ফুঁসে ওঠে। তর্জন-গর্জন করতে করতেই বেরিয়ে আসে জব্বরের উঠোন থেকে।

শুনানীর দিন ধার্য হয়েছে। লালমোহনের উকিল প্রথমে টিপসই পরীক্ষায় না গিয়ে সাক্ষী-সাবুদ দিয়েই দলিলের সত্যতা প্রমাণ করতে চান। দলিলের ইসাদীরাই সাক্ষী দেবে।

প্রথম ইসাদী হারু ঘোষ কাঠগোড়ায় ওঠে। আদালতের নিয়ম অনুযায়ী শপথ নেয়, যা বলবো সত্য বলবো—মিথ্যে বলবো না।···

জব্বরের উকিল জেরা শুরু করেন হারুকে। আচ্ছা, আপনি তো বলছেন, দলিল লেখার সময়ে আপনি উপস্থিত থেকে ইসাদী হয়েছেন।

হারু ঘাড় নাড়ে, আইজ্ঞা হ, আমি বি কাচেই আচিলাম।

বেশ বেশ ভাল কথা। আচ্ছা, এবার বলুন তো, যে ঘরে বসে দলিল লেখা হয়েছিল সে ঘরটা পূর্বমুখো না পশ্চিমমুখো?

আইজ্ঞা, ওটা বি পশ্চিম-মুইখা ঘর।

খুব ভাল। এবার বলুন তো, যে কলম দিয়ে দলিল লেখা হয়েছিল সেটা কাঠের কলম ছিল না লোহার কলম ছিল?

আইজ্ঞা, কি যে বি কন স্যার! কাঠের কলম অইব ক্যান? ওটা বি নোয়ার কলম আচিল।

বেশ, আপনি নামুন।

হারু ঘোষ নমস্কার জানিয়ে নেমে আসে। বেরিয়ে যেতেই উদ্যত হয়। আদালতের পুলিস বাধা দেয়। হারু এক কোণে গিয়ে বেঞ্চের ওপর বসে।

দ্বিতীয় ইসাদী ক্ষেত্র ঘোষের ডাক পড়ে।

ক্ষেত্রও যথারীতি কাঠগোড়ায় উঠে দাঁড়ায়। শপথ নেয়। জব্বরের উকিল তাকেও জেরা শুরু করেন, আপনি দলিল লেখার সময় উপস্থিত ছিলেন তো?

আইজ্ঞা হুজুর, কি য্যান কন! কাচে না থাকলে সাক্ষী বি অইলাম কেমুন কইরা!

উত্তম কথা। তাহলে এবার বলুন তো, দলিলটা ঘরে বসে লেখা হয়েছিল না বাইরে বসে লেখা হয়েছিল?

আইজ্ঞা ঘরে বইসা। বাইরে আবার টেকা পয়সার লেন-দেন হয় নাকি ?

খুব ভাল কথা। তাহলে এবারে বলুন তো, যে ঘরে বসে দলিল লেখা হয়েছিল সেটা পূবমুখো ছিল না পশ্চিমমুখো ছিল ?

আইজ্ঞা, ওটা ত বি পশ্চিম-মুইখা ঘর নয়। ওটা পূব-মুইখা ঘর।

ঠিক বলছেন তো ?

আলবৎ হুজুর। ওটা বি পূব-মুইখা ঘর।

বহুৎ আচ্ছা। তাহলে আপনি বলছেন, যে কলম দিয়ে দলিল লেখা হয়েছিল সেটা লোহার কলম ছিল ?

না না হুজুর, লোহার কলম বি অইব ক্যান ? ওটা আছিল কাঠের কলম।

ক্ষেত্রর সাক্ষী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদালতের কাজ সেদিনের মতো মুলতবী থাকে।

জব্বরের উকিল খুশীই হন। গদ্‌গদ হয়েই জব্বরকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে আসেন, যা সাক্ষী দিয়েছে, মামলার তো দফারফা। কি খাওয়াবেন খাওয়ান মিঞা সাহেব।

উকিলবাবুর খুশীতে জব্বরও খুশী হয়। সুদখোরটা তাহলে সত্য সত্য টিট হলো। না না, অধর্ম ও এতটুকু করে নি। এ পর্যন্ত যে হারে সুদ গুণে এসেছে তাতে হাজার কেন তিন হাজার মারলেও অধম হয় না। আর তা হয় না বলেই আল্লাহ্ ওর মুখ রেখেছেন।...গদ্‌-গদ হয়েই উকিলবাবুর প্রশ্নের জবাব দেয়, মিঠাই ত বি আউজকা পাওনাই আপনার। কন, কি মিঠাই বি খাইবেন ?

জব্বর আর জব্বরের উকিল মিলে হাসতে হাসতে আদালত থেকে বেরিয়ে আসে। লালমোহন চোখে সরষেফুল দেখে। হকের ধন হারু আর ক্ষেত্রর দোষেই মারা গেলো। শালারা নিশ্চয় ঘুষ খেয়েছে।... লালমোহনের উকিল হারু আর ক্ষেত্রকে শাসাতে শাসাতেই আদালত থেকে বেরোয়। না, আর কিছু করার নেই। পরাজয় অনিবার্য।...

করার নাই! কন কি বি আপনে? আমারে বি সাক্ষী মানেন না, মিঞা জানরে বুজাইয়া দিমুনে করার কিছু আচে কি না আচে, লালমোহনের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় রসিক ঘোষ।

নিজের জ্বালায় জ্বলছে লালমোহন, রসিকের কথায় খেঁকিয়ে ওঠে, কি দিল্লাগী কর মশয়? মাইনষের সময়-অসময় বি বোজ না?

আরে বণিক্য মশয়, চটেন ক্যান। সময় বুজাই ত বি আপনার কাচে আইলাম। আমারে বি সাক্ষী মানেন। জিতাইয়া না দিবার পারলে পাঁচ জোতা খামু আপনার হাতে।

লালমোহন আবারও তেড়ে উঠতেই যাচ্ছিল উকিলবাবু বাধা দেন। ভ্রূ কুঁচকিয়েই প্রশ্ন করেন, কি বলতে চান আপনি?

বেশী কিছু কইবার চাই না জি। হার ত আপনাগ এমনেও অইচে অমনেও বি অইচে। আর পাঁউচ গা টেকা খরচ করেন, জব্বর মিঞারে জবর শিক্ষা দিয়া দেই।

হেঁয়ালি রেখে যা বলবেন স্পষ্ট ক'রে বলুন, উকিলবাবু আবার বাধা দেন।

হেঁয়ালি কিছু করবার চাই না স্যার। আপনে খালি বি এউগা দরখাস্ত কইরা দ্যান। লেইখা দ্যান, আমার আর একজন সাক্ষী আচে—সাফাই সাক্ষী।

সাফাই সাক্ষী! কে সে?

ক্যান স্যার, আপনার সামনে বি খাড়ইয়া রইচি। আপনে খালি বি আমারে একবার কাঠগোড়ায় খাড়ইবার সুযোগ দ্যান না, মিঞার পো'রে আমি ভাল কইরা মিঠাই খাওয়ামুনে।

কি সাক্ষী দেবেন আপনি?

আমার মাথা খান স্যার। ওডা বি জিগাইবেন না। যদি জিতাইবার পারি নগদ এক শ' টেকা দিবেন নইলে মারবেন আপনার পায়ের পাঁচ জোতা।

উকিলবাবু আর লালমোহন থ বনে যায়। বলছে কি লোকটা! চেনা নেই শুনো নেই সাক্ষী দেবে! তা আর যাই হোক, মতলবটা

নেহাত মন্দ দেয় নি। দরখাস্ত একখানা ক'রে দেওয়া যাক। ও না দিক অন্য কাউকে দিয়ে সাক্ষী দেওয়ানো যাবে।

কি দোন্দর-মোন্দর করেন স্যার? মা ঢাকেশ্বরীর নাম লইয়া হ্যান বি এউগা দরখাস্ত ছাইড়া। তবে জিতাইবার পারলে কইলাম টেকা এক শ' দিবেন সেটাও বি কসম খান।

উকিলবাবু আর ভাবতে পারেন না। লালমোহনও না। রসিকের কথামতো একখানা দরখাস্তই পেশ করেন। বোধ হয় জাদুই জানে রসিক।

পরদিন আবার মামলা শুরু হয়। রসিক সাক্ষীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে অবিচলিতভাবেই শপথ নেয়।

জব্বরের উকিল প্রশ্ন করেন, দলিলে তো আপনার নাম নেই আপনি কি ক'রে সাক্ষী দেবেন?

ঐ যে বি কইলাম স্যার, আমিও তখন লালমোহনবাবুর কাচে টেকা কর্জ নিবার গেচিলাম।

বেশ, তাহলে আপনি বলুন তো, যে ঘরে বসে দলিল লেখা হয়েছিল সেটা কোন্ মুখো ছিল?

আইজ্ঞা স্যার, সেটা বি আপনি পূব-মুইখাও কইবার পারেন আবার পশ্চিম-মুইখাও বি কইবার পারেন।

কি রকম?

আইজ্ঞা স্যার, পূবদিগেও ওটার বি একটা দরজা আচে আবার পশ্চিমদিগেও বি একটা দরজা আচে।

হুঁ। বেশ বলুন তো, যে কলম দিয়ে দলিল লেখা হয়েছিল সেটা কাঠের কলম ছিল না লোহার কলম ছিল?

আইজ্ঞা হুজুর, ওডা বি আপনে কাঠের কলমও কইবার পারেন আবার বি নোয়ার কলমও কইবার পারেন।

কি রকম?

আইজ্ঞা স্যার, হ্যাণ্ডেলটা বি কাঠের নিবটা বি নোয়ার।

জব্বরের উকিল আর প্রশ্ন করতে ভরসা পান না। হাতের

মাছ ফসকে গেলো। সওয়াল করবেন উনি? এর পরে আর ঠেকাবেন কি দিয়ে ?...

জব্বরের উকিল ভিরমি খান—লালমোহনের উকিল গদ্‌গদ হয়ে বলেন, সাবাস রসিকবাবু সাবাস! এমনটি যে আমি নিজেও ভাবতে পারি নি। সাবাস...

রসিক মৃদু মৃদু হাসে আর গোঁফে তা দেয়।

মহারাজা হরচন্দ্র

'মহারাজা অব্ নাটোর' উনি নন। গড়ের মাঠের জমিদারীও ওঁর নেই—কিংবা লাখ টাকা ব্যাঙ্কে। হাসপাতালে পঞ্চাশ হাজার দান ক'রে সরকারী খেতাবও ওঁর ভাগ্যে জোটে নি। কিন্তু তবু উনি মহারাজা।

হ্যাঁ, মহারাজা। গঞ্জের চণ্ডীমণ্ডপের একচ্ছত্র অধিপতি উনি। কিন্তু ওঁকে সেবায়েত কিংবা পাণ্ডা ভাবলে ভুল করা হবে। উনি হলেন মণ্ডপের শিরোমণি—গঞ্জের মহারাজা। অর্থাৎ গঞ্জের পাঁচজন মিলে যে চণ্ডীমণ্ডপ প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেখানে দোল-দুর্গোৎসব থেকে আরম্ভ ক'রে পঞ্চায়েতের আসর বসে, উনি হলেন তার মাথা। আসল মাথা জমিদার-নন্দন মেজ কুমার হলেও মহারাজা নামের অধিকারী একমাত্র হরচন্দ্রই।

ফলমূল, মেওয়া, মাখন, মিছরী, তা সে যত রকমের উপকরণই থাক না কেন, আসলে চিনির মণ্ডটি না হলে যেমন নৈবেদ্য শোভা পায় না তেমনি মহারাজা না হলে পঞ্চায়েতও জমে না। সুতরাং কার্যকারণে বহাল তবিয়তেই উনি সিংহাসনে সমাসীন আছেন।

'হরিশ্চন্দ্র' নাটকাভিনয় মঞ্চস্থ করা ঠিক হয়েছে। প্রতিরাত্রে চলেছে নিয়মিত মহড়া। পঞ্চায়েতের অন্যান্য সকলে রোজকার কাজ-কর্ম সেরে রাত আটটা সাড়ে আটটায় এসে জমতে থাকে। কিন্তু মহারাজার বেলায় সেটি হবার জো নেই। বিকেল চারটে বাজতে না বাজতেই মণ্ডপ ঝেড়ে-পুঁছে ওঁকে দরবার ঠিক রাখতে হয়। সন্ধ্যা বাতি জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে বিয়াল্লিশ ক্যাণ্ডেলের জুয়েল ধরিয়ে অপেক্ষায় থাকতে হয়। হুঁকো, কলকে, টিকে, তামাক, সব ঠিক। এখন পাত্র-মিত্রেরা এলেই দরবারের কাজ শুরু হবে।

মণ্ডপের অর্ধেক জুড়ে ফরাস বিছানা। মেজ কুমার তাকিয়া ঠেস দিয়ে মাঝখানটিতে বসেন। সামনে থাকে গড়গড়া ও রূপোর পানের ডিবা। একপাশে স্থান পান নাচের মাস্টার ও প্রমটার। আর-এক পাশে ডিরেক্টর। ডিরেক্টর জ্ঞানপ্রকাশ আবার ভিন গাঁয়ের মানুষ। আবগারী লাইসেন্স নিয়ে গঞ্জে এসেছেন। পদমর্যাদায় পোস্ট মাস্টার, হেড মাস্টার ও দারোগার সমতুল্য। ওঁদের সঙ্গেই ওঁর চলাফেরা—ওঠা-বসা। নট-কুশলী বলে পঞ্চায়েতেও সমধিক খাতির। মেজ কুমারের পাশে উনিও একটি তাকিয়া পান।

সন্ধ্যা সাতটা। বিয়াল্লিশ-ক্যাণ্ডেল-জুয়েল জ্বালিয়ে মহারাজা একাকী প্রহর গুণছিলেন—একযোগে এসে প্রবেশ করে মরণচাঁদ ও ননীচাঁদ। যথাক্রমে হারমোনিয়ম বাদক ও তবল্‌চী। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আরও জনকয়েক খুদে অভিনেতা ও দর্শক। মহারাজা দরজার একপাশে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন। খালি গা—বলিষ্ঠ চেহারা। নাভির নীচে ইঞ্চি-পাড় ধুতি পরা—হাঁটু পর্যন্ত। মাথার চুল, গায়ের লোম, চাড়ানো গোঁফ সবই বাদামী রঙের। জুয়েলের উজ্জ্বল রোশনাইতে রীতিমতো জেল্লাই দিচ্ছে। পুরু ঠোঁটে অষ্টপ্রহর হাসি লেগে আছে। আগন্তুকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একযোগে বত্রিশ পাটিই নজরে পড়ে।

মরণচাঁদ যথারীতি এসে অর্গান খুলে বসে। ননীচাঁদও তবলা নিয়ে। মন্দিরায় সমতা রাখে ভজুঠাকুর। মিনিট পনেরো পুরো দমে চলে মনোহারী কন্‌সার্ট। বাজনার তোড়ে ছেলেপুলেরা এসে ভিড় করে। কিন্তু মহারাজার কাছে সেটি হবার নয়। পার্ট নেই তো প্রবেশ নেই! কাউকে লেখাপড়ার খোঁটা দিয়ে, কারো কান ধরে এলাকার বাইরে তাড়িয়ে দেন!

কন্‌সার্টের লহরায় মশগুল মহারাজা। শিরায় শিরায় নেচে উঠছে রাজকীয় উন্মাদনা। আরও খানিকটা চললে বেশ জুতসই হয়। কিন্তু মরণচাঁদ সহসা বাজনা থামিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, চল ননী, উঠে পড়ি। এ রাজ্যে ভদ্রতা বলে কোন পদার্থ নেই!

চোখ বুজে তালে তালে দুলছিলেন মহারাজা, সুর-ভঙ্গে চোখ খোলেন। কিন্তু কোন ত্রুটি ধরতে পারেন না। সবিস্ময়ে মরণচাঁদের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন।

ননীচাঁদ মরণচাঁদকে সমর্থন ক'রে আরও এক ডিগ্রি ওপরে ওঠে, কি মহারাজ, আপনি থাকতে আমরা তামাক সেজে খাবো নাকি ? বেশ, চলরে মরণ, তবলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ননী।

ননীর প্রশ্নে বুঝিবা সংবিৎ ফিরে পান মহারাজা। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ননীর পথরোধ ক'রে দাঁড়ান। সোৎসাহেই বিস্ময় প্রকাশ করেন, আমি থাকতে তোরা তামাক সেজে খাবি তার মানে ! বোস বোস হচ্ছে। আর একখানা হোক।

মরণচাঁদ সে কথায় কান না দিয়ে গজরাতে থাকে, আরে যান মশায়, আপনাকে মহারাজ ক'রেই আমাদের ঝকমারি হয়েছে। সতীশ ঘোষকে মহারাজ করলে আর বলতে হতো না। এতক্ষণে দু'ছিলিম হয়ে যেতো !

কি বললি বেটা ছুতারের পো, আমি থাকতে ঐ সইতা গোয়াল হবে মহারাজ ! যা বেটা, তাই করগে, আমি চললাম।—রাগে কাছা খুলে যায় হরচন্দ্রের। কোনরকমে সামলাতে সামলাতে মণ্ডপ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হন।

সর্বনাশ ! আজ তো তাহলে পান বিড়ি চা সিগারেট কিছুই আর আনা যাবে না ! নাচের ছোকরাদেরই বা ডাকবে কে ?—ভজু তাড়াতাড়ি হাতের মন্দিরা মাটিতে নামিয়ে রেখে ছুটে গিয়ে মহারাজার হাত চেপে ধরে। একান্ত আনুগত্য রেখেই অনুরোধ জানায়, কি করছেন মহারাজ ! প্রজার কোন সুখ-দুঃখই আপনি বুঝবেন না ? সামান্য এক ছিলিম তামাকই না হয় মরণ খেতে চেয়েছে, তার জন্য রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হবেন ?

রাগে থরথর ক'রে কাঁপছিলেন মহারাজা, ভজুর অনুরোধে থমকে দাঁড়ান। রাগত নেত্রেই চোখ তুলে তাকান। বুঝিবা মদনভস্মই হয়ে যায়।

কিন্তু ভজু হটে না। মনোমোহিনীর মতোই হাসি হাসি মুখে মহারাজার কানে কানে কি যেন ফুস্‌মন্ত্র দেয়।

মুহূর্তে গলে জল হয়ে যান মহারাজা। চো-খেমুখে প্রসন্নতা নেমে আসে। মরণচাঁদের উদ্দেশে গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে টিকায় আগুন দেন।

মরণচাঁদ ননীচাঁদ চোখ টেপাটেপি ক'রে যার যার যন্ত্রে তালিম ঠুকতে থাকে।

মহারাজা যথারীতি হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে ফুঁ দিতে দিতে কাছে এসে হুঙ্কার ছাড়েন, খা বেটা তুই তামাক, দেখি ক' ছিলিম খেতে পারিস! আমার রাজ্যে তামাকের খোঁটা!

মরণ মুচকি হেসে হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে কাকুতি জানায়, রাগ করলেন মহারাজ?

আমি তোর কোন কথা শুনতে চাইনে। সইতা গয়লা না তোকে দু' কলকে তামাক খাওয়াত বললি, আমি তোকে সাত কলকে তামাক খাওয়াবো! আগে খাবি পরে কথা বলবি।—হাতের হুঁকোটা মরণচাঁদের হাতে দিয়ে ছুটে গিয়ে আরও দু'টো জ্বলন্ত কলকে নিয়ে আসেন।

প্রথম দমকে মরণ বেশ আমেজ ক'রেই টানতে থাকে। সুখ টান দিয়ে হুঁকোটা ননীর হাতে দিতে যায়।

মহারাজা রুখে দাঁড়ান, উঁহু বেটা, সেটি হবে না। ননীকে আমি আলাদা তামাক দিচ্ছি। তুই বেটা খোঁটা দিয়েছিস, তোকে একাই সাত কলকে গিলতে হবে।

মরণ ফ্যাসাদে পড়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার জোরে জোরে হুঁকো টানতে থাকে। টানতে টানতে সহসা মগজের জানালা খুলে যায়। মহারাজার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার এই হলো অপূর্ব কৌশল। মরণ নিঃশেষিত কলকের সজোরে একটা টান দিয়ে ভিরমি খায়।

ভজু সময়মতো ধরে ফেলেছে তাই। নয়তো হুঁকোটাই ভেঙে একাকার হতো।

ননী মরণকে আলগিয়ে মহারাজার কাছে নালিশ জানায়, প্রজা-হত্যার পাতক কুড়োচ্ছেন মহারাজ! সাম্রাজ্য যে আপনার ধ্বংস হয়ে যাবে। রাজা রামচন্দ্রও নিষ্কৃতি পান নি জানবেন।

মহারাজা তবু দৃঢ় থেকেই শাসাতে থাকেন, তা যাক। কিন্তু ও বেটা কেন আমাকে তামাকের খোঁটা দিলে! ওর সাধের সইতা মহারাজ এসে এখন রক্ষা করুক ওকে! দেখি কত মুরুদ গয়লার পো'র!

ক্ষান্ত হোন ক্ষান্ত হোন মহারাজ! ধর্মরাজ্যে সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। প্রজাহত্যা ব্রহ্মহত্যারই শামিল জানবেন। এখনও সময় আছে, ক্রোধ সংবরণ করুন।—ভজু বশিষ্ঠ মুনির কণ্ঠ নিয়েই করজোড়ে কাছে এসে প্রার্থনা জানায়।

মহারাজা বোধ হয় এবার সত্যি সংবিৎ ফিরে পান। গলার স্বর খাদে নামিয়েই সাড়া দেন, তুই বলছিস?

আমি একা নই মহারাজ! রাজ্যের সমস্ত প্রজা সমস্ত অমাত্য নতজানু হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। মরণকে আপনি পুত্রজ্ঞানে ক্ষমা করুন, দোহাই আপনার!—ভজু সত্যি সত্যি নতজানু হয়েই মহারাজার হাত চেপে ধরেন।

মরণ চোখ কপালে তুলে অসাড়ে পড়ে আছে। শ্বাস নিতে যেন খুবই কষ্ট ওর।

মহারাজা আর স্থির থাকতে পারেন না। হাতের জ্বলন্ত কলকে মাটিতে নামিয়ে রেখে মরণের শিয়রে এসে বসেন। নিজের কোঁচার খুঁট দিয়ে মাথায় বাতাস করতে থাকেন। চোখে-মুখে ব্যাকুলতার ছাপ।

ভজু জয়ধ্বনি দেয়, জয়—মহারাজা হরচন্দ্রের জয়।

মরণ লাফ দিয়ে উঠে প্রতিধ্বনি করে, জয় মহারাজা হরচন্দ্রের জয়।

বিপিন পণ্ডিত

চরফুটনগরের মোড়ল মধু মণ্ডল। সুখের সংসার মধুর। খাওয়া-পরায় নিশ্চিন্ত। ধান, পাট, মুগ, কলাই, মসুর খামার থেকে আসে। নগদ পয়সা আসে বাড়তি শস্য বেচে। এ ছাড়া আছে গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ। মধুর সংসারে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। দোল, দুর্গোৎসব, মহোৎসব যে দিনের যা। ধর্ম-মাস কার্তিক মাসের প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। পুণ্যাহে অষ্টপ্রহর মহোৎসব। ভাগবত পাঠ করে কুলগুরু নরেন গোসাঁই। খাসা গোলগাল চেহারা নরেনের। মাথা ভর্তি বাবরি চুল—গৌরবর্ণ। কণ্ঠস্বরটিও মধুর। গাঁয়ের মানুষ সারাদিন ক্ষেত-খামারে চাষাবাদ ক'রে সন্ধ্যায় এসে জমায়েত হয় মোড়লের বাড়ি। গঞ্জ থেকে আসে শ্রীধর খোলী, গোবিন্দ কীর্তনিয়া ও অখণ্ড সাধু। নরেনের মুখের পাঠ শুনে সকলেই ওরা মুগ্ধ।

নিয়মিত ভাগবত পাঠ নরেনই ক'রে চলেছে। পুণ্যাহের আর মাত্র সাত দিন বাকি। মধুর একমাত্র জামাই বিপিন আসে শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে। ঠিক বেড়াতে আসে না, মধুই ওকে পুণ্যাহের আগে নিমন্ত্রণ ক'রে আনায়। গেলো শ্রাবণে হরিদাসীর সঙ্গে বিপিনের বিয়ে হয়েছে। হরিদাসীর বয়স চৌদ্দ—বিপিনের উনিশ। গেরস্ত ঘরে সাধারণত এত বড় ছেলে-মেয়ে অবিবাহিত থাকে না। কিন্তু বিপিনকে থাকতে হয়েছে। বিপিনের মা বেঁকে বসেছিল, আঠারোর আগে ছেলের বিয়ে দেবে না। কেন না, কুলগুরু বিপিনের হাত দেখে বলেছিলেন, আঠারো পর্যন্ত ওর সাংঘাতিক ফাঁড়া আছে। সুতরাং বিপিনের জন্য হরিদাসীকেও হরিনাম জপ ক'রেই দিন গুণতে হয়েছে। মধুতে আর বিপিনের বাবা দীনুতে হরিহরআত্মা।

ছেলেমেয়ে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের উদ্বাহের ব্যবস্থাও পাকা ক'রে ফেলেছিল।

বিপিনের সুখ্যাতি চরফুটনগর জুড়ে। যেমন দেখতে-শুনতে তেমন বিদ্যা-বুদ্ধিতে। স্বাস্থ্যও কি সুন্দর নিটোল। চরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা বিপিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জামাই-এর প্রশংসা শুনে শ্বশুর-শাশুড়িও গর্বিত। হরিদাসীর তো কথাই নেই। আকাশের চাঁদই যেন ওকে ধরে দিয়েছে মধু।

ভাগবত পাঠ নিয়মিত নরেনই ক'রে যাচ্ছে। বাকি ক'দিনও ক'রে যাবে। কিন্তু পুণ্যাহের দু'দিন আগে অবস্থার বিবর্তন ঘটে। প্রাত্যহিক আসর সমাপ্তির পর অখণ্ড সাধু উঠে দাঁড়ায়। একান্ত বিনীতভাবেই নরেনের উদ্দেশে নিবেদন করে, প্রভুপাদ, আপনি যদি অপরাধ না নেন তাহলে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই।

ভাগবত পাঠ শেষ ক'রে নরেনের তখন তথাগত প্রাণ। গদ্গদ হয়েই অনুমতি দেয়, কি বলবে নিঃসঙ্কোচে বলো সাধু।

অখণ্ড গাম্ভীর্য রেখেই নিবেদন করে, প্রভু, আমি প্রস্তাব করছি, বাকি দু'দিন আমাদের জামাই বাবাজীবন পাঠ কীর্তন ক'রে শোনাবেন। শুনেছি বাবাজী সুপণ্ডিত। নাম-গানেও অনুরাগ আছে।...

সাধু—সাধু! অতি উত্তম প্রস্তাব তোমার। আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে সমর্থন করি। এ বেশ ভালই হলো। দু'দিন বিশ্রামের অবকাশ জুটবে। তাছাড়া বাবাজীবনের মুখে আমিও লীলা-মাহাত্ম্য শুনতে পাবো। এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে!

নরেনের অকুণ্ঠ সমর্থনে সমস্ত সভা উল্লসিত হয়। বিপিন আসরেই উপবিষ্ট আছে। সকলে মিলে একযোগে সাধুবাদ জানায়।

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে বিপিন। হ্যাঁ, না কিছুই বলতে পারে না। শ্রোতারা জয়ধ্বনি দিয়ে সেদিনের মতো উঠে পড়ে। সকলের মনেই খুশীর হাওয়া।

পরের দিনের আসরে তিল-ঠাঁই থাকে না। পাঠ-মঞ্চ অতি উৎকৃষ্ট ক'রে সাজানো হয়েছে। বিপিন গরদের জোড় পরে তাকিয়া

ঠেস দিয়ে উপবিষ্ট। ললাটে সুচারু চন্দন-লেখা। গলায় শ্বেত-শুভ্র মালতীর মালা। সুগন্ধি ধূপ জ্বলছে দু'দিকে। গোবিন্দ কীর্তনিয়া জয়ধ্বনি দিয়ে প্রারম্ভিক কীর্তন আরম্ভ করে। জয়ধ্বনি দিয়েই কিছুকাল পরে আবার তা শেষ হয়। বিপিন ভাব-বিহ্বল। বাহ্যিক কোন চেতনাই যেন ওর নেই। বেদীর ওপর শ্রীমদ্ভাগবত খোলা রয়েছে। আজকের পাঠ রাস-লীলা। সমস্ত আসর নিস্তব্ধ। শ্রোতা মাত্রই উৎকর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু বিপিনের কোন সাড়া-শব্দ নেই। ভাগবত খুলে ঠায় বসে আছে তো বসেই আছে। অবিরত অশ্রু ঝরছে দু'নয়ন বেয়ে। নরেন পাশের আর একখানি আসনে উপবিষ্ট। সমস্তই অবলোকন করছে। তার চোখেও প্রেমাশ্রু ধারা। ওদের দেখাদেখি সমস্ত আসরই আজ কান্নায় উদ্বেলিত। কে পাঠক কে শ্রোতা কিছুই ঠিক-ঠিকানা নাই। অবশেষে নরেন আবেগ-জড়িত কণ্ঠেই ঘোষণা করে, ভক্তগণ, আজ আর পাঠ-যজ্ঞ সম্ভবপর নয়। বাবাজীবন লীলাময়ের ভাবাবেগে আপ্লুত। আজ আপনারা শুধু নাম কীর্তন করুন। জয়ধ্বনি দিন। বদনভরে বলুন, হরি বোল— হরি হরি বোল···

নরেনের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি পড়ে। গোবিন্দ কীর্তনিয়া আবার নাম কীর্তন শুরু করে। ভাবাবেগে শ্রীধর আর বসে থাকতে পারে না। খোলসহ উঠে দাঁড়ায়। নৃত্য সংযোগে বাজাতে থাকে। শ্রীধরের দেখাদেখি অন্যান্য সকলেই উঠে পড়ে। দু'বাহু তুলে নাচতে থাকে। মেয়েরা ঘন ঘন উলু দেয়। সমস্ত আসর ভাব-চঞ্চল। মধু দু'হাতে হরিলুট ছিটাতে থাকে। রাত প্রায় ন'টা পুনরায় জয়ধ্বনি দিয়ে ক্ষান্ত হয় সকলে।

আজকের পরিবেশে কেউ কেউ আশাতীত খুশী, কেউ কেউ আবার মুহ্যমান। মুহ্যমান যারা তাদের অভিযোগ, প্রাণভরে আজ আর তারা প্রভুর লীলা-মাহাত্ম্য শুনতে পেলো না।

বিপিন পাঠ করবে শুনে আজ অনেক নতুন শ্রোতার সমাবেশ ঘটেছে। কিছু সংখ্যক ছেলে-ছোকরাও ভিড় করেছে। গঞ্জের

ইস্কুলের ছাত্র ওরা। বিপিনের তুরীয় অবস্থা ওদের কারো কারো কাছে জুতসই ঠেকে না। জনকয়েক একত্রিত হয়ে বেদীর দিকেই এগিয়ে যায়। বিপিনের ছ্'চোখে তখনও অশ্রু ঝরছে। দলের একজন কুতূহল চাপতে পারে না। ঝুঁকে পড়ে সহৃদয়তা জানায়, উঠুন জামাইবাবু, আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ?

বিপিনের ছ্'চোখ উন্মিলিত হয়। গাম্ভীর্য রেখেই উত্তর করে, না, কষ্ট আর কি ভাই ? তবে···

তবে কি জামাইবাবু ?

কথাটা কি জানলে ভাই, অনেক দিন পুথি-পুস্তকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নেই। তাই মনে হচ্ছে, অক্ষরগুলো সব কেমন যেন রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু এর আগে যখন আমি ওদের দেখেছিলাম তখন ওরা বেশ মোটাসোটা ছিল। চিনতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নি। কিন্তু বহুদিনের অসাক্ষাতে মনে হচ্ছে ওরা যেন কেমন একজন আর একজনের ঘাড়ে চেপে আছে। কি যে বিদকুটে দেখাচ্ছিল কিছুতেই চিনতে পারছিলেম না।···

বিপিন কথা শেষ করতে পারে না। ফাজিল ছোকরারা হেসে কুটিকুটি হয়। ওর সঙ্গে সঙ্গে দলের সকলেই। হাসতে হাসতে ছোকরা আবার ফোড়ন কাটে, হায় হায় হায় ! একটু আগে বললেন না জামাইবাবু ! একখানি প্রথম পাঠ এনে দিতেম বেশ সুর ক'রে সকলকে শুনিয়ে দিতেন !

নরেন গোসাঁই তখনও বিপিনের পাশেই উপবিষ্ট ছিল, ছোকরার তামাশায় না হেসে পারে না।

বিপিন ফাঁপরে পড়ে। কোন রহস্যই উদ্ঘাটন করতে পারে না। শুধু ফ্যালফ্যাল নেত্রে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পৌষ-পার্বণ

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রমোহন গঞ্জের হাটুরে। বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন। খর্বকায়—গোলাকৃতি। গায়ের রং ঈষৎ তামাটে। সর্বদা খালি গায়ে থাকতে ভালবাসেন। হাট-বাজারে ওর মান-মর্যাদাও আলাদা। চাষী-মজুর কামার-কুমোরের মতো শাক-সবজি হাঁড়ি-পাতিল উনি বেচেন না। ফড়ের মতো পাটের গোছা ধরে টানাটানি করতেও ওর সরমে বাধে। কিন্তু তবু উনি হাটুরে। ওর কারবার কুলীন তরি-তরকারি আর ফলমূল নিয়ে।

গাঁয়ের হাট-বাজারে আম, জাম, নারিকেল, কলা-কাঁঠাল প্রচুর মিলবে। কিন্তু মিলবে না আঙুর, বেদানা, আপেল-ন্যাসপাতি। থোড়, মোচা, আলু, বেগুনের ছড়াছড়ি হলেও ফুলকপি, বাঁধাকপি, বীট, গাঁজর পাওয়া দুষ্কর। ইন্দ্রমোহনের কারবার এইসব মোগলাই খানা নিয়ে। টাকায় টাকা লাভ।

হাটের আগের দিন গয়নার নৌকোয় চড়ে ঢাকা ছোটেন ইন্দ্রমোহন। বাড়ি ফেরেন হাটের দিন সকালে পণ্য নিয়ে। টাটকা-টাটকি ব্যাপার। গঞ্জের হাটে ইন্দ্রমোহনের কদরই আলাদা। আলাদা শুধু কুলীন তরি-তরকারি বেচে বলে নয়—ব্যক্তিগত কারণেও।

গঞ্জের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট অনন্তদেব রায় চৌধুরী। একাধারে জমিদার ও মহাজন। কবিরাজ রাখাল দত্ত বহুবার অনন্তদেবকে ভোটযুদ্ধে ডিগবাজী খাওয়াতে চেষ্টা ক'রে হালে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু হাল ছাড়েন নি ইন্দ্রমোহন। ওর ধারণা, ভোটযুদ্ধে নামবার কোন প্রয়োজন নেই। প্রেসিডেণ্ট করার আসল মালিক হলো দারোগাবাবু অর্থাৎ বড়বাবু। আবার বড়বাবুকে হাত করতে হলে আগে চৌকিদার দফাদারকে হাত করা চাই।

জগৎ-পতি জগন্নাথ দর্শনের জন্য চাই ভাল পাণ্ডার নিশানা। তাই হাটে বড়বাবুর পেয়ারের দফাদার মহেন্দ্র এলেই ইন্দ্রমোহন ওকে ডেকে এনে খাতির করেন—পান-সিগারেট খাওয়ান।

সেদিন শনিবারের হাট চলেছে। ইন্দ্রমোহন বেচা-কেনায় ব্যস্ত। দম নেবার ফুরসত নেই। সহসা মহেন্দ্র এসে হাজির। বড় উৎফুল্ল দেখায় মহেন্দ্রকে। খুশীতে গদ্‌গদ হয়েই উচ্ছ্বাস জানায়, নমস্কার স্যার, আপনি তো দেখছি বড্ডো ব্যস্ত। একটা খবর ছিল। আচ্ছা আর-এক সময়ে আসবো।—মহেন্দ্র পেছন ফিরতে যায়।

ইন্দ্রমোহনের হাতের দাঁড়ি হাতেই থাকে। মাপ ভুলে যান। হন্তদন্ত হয়ে বাধা দেন মহেন্দ্রকে, আরে যান ক্যান দফাদার সাহেব, আমার আবার কাম কি? আহেন, পান-সিগ্রেট খান।

মহেন্দ্র ফিরে দাঁড়ায়। মিটমিট ক'রে হাসতে থাকে।

বেদানার ক্রেতা তাহের আলি তাড়া দেয়, অ মশায়, কি হইল তোমার? তরাতরি ছ্যাও না ব্যাদানাটা মাইপা? আমার যে আবার নাও ছাইড়া যায়!

ছাইড়া যায়, যাউক আমি তার কি করুম! এখন কোন কিচু মাপন-মোপন যাইব না। দেখবার পাও না, দফাদার সাহেব আইচেন। —ইন্দ্রমোহন ফুঁসে ওঠেন।

উত্তর শুনে তাহের আলিও সমানেই ফুঁসে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারে না। ঘরে রুগী রয়েছে। বেদানাটা না নিলেই নয়। বিরক্তির সঙ্গেই দাঁড়িয়ে থাকে।

মহেন্দ্র খানিকটা লজ্জায় পড়ে। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই বলে, আমি একটু ঘুরেই আসি স্যার। আপনার খদ্দের রয়েছে, বেচাকেনা করুন।—আবার পেছন ফিরে কয়েক পা এগিয়ে যায় মহেন্দ্র।

ইন্দ্রমোহন এক লাফে ফলের ঝুড়ি ডিঙিয়ে ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরেন। বিনয়ের সঙ্গেই বলতে থাকেন, বেচাকিনি ত রোজই করি, আপনারে পাই কয়দিন? দয়া কইরা যখন আইচেন দুই কোয়া খাজৈর খাইয়া যান। নতুন খাজৈর আমদানী করচি এই হাটে।

মহেন্দ্র প্রতিবাদের আর কোনরকম সুযোগ পায় না। ইন্দ্রমোহন হাত ধরে একরকম টানতে টানতেই ওকে নিজের দোকানে নিয়ে আসেন।

খেজুর খাবার লোভেই হয়তো কথাটা মনে হয়েছিল মহেন্দ্রর। তাই খেজুর হাতের মধ্যে পেয়ে খুশীতে গদ্‌গদ হয়ে ওঠে। ইন্দ্রমোহনের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস ক'রে বলতে থাকে, কাউকে যেন বলবেন না স্যার। আমার মাথার দিব্যি। আপনাকেই শুধু চুপি চুপি বলছি। আজকে সদর থেকে এস, পি, বাহাদুর এসেছিলেন। বড়বাবু আপনার কথা চুটিয়ে বললেন। সামনের মাসেই অনন্তবাবুর চাকরি খতম। আর সে জায়গায় বসছেন আপনি।—হিহি ক'রে হাসতে হাসতে একসঙ্গে দু'কোয়া খেজুর মুখে পুরে চিবুতে থাকে মহেন্দ্র।

ইন্দ্রমোহন আঁতকে ওঠেন। একি শুনছেন উনি! সামনের মাসেই চেয়ারে গিয়ে বসছেন! অনন্তদেব তা হলে এতদিনে টিট হলো! আবেগে ভাল ক'রে মুখ দিয়ে কথা সরে না। থিতিয়ে থিতিয়েই বলেন, কন কি দফাদার সাহেব? বারঠাকুর তাইলে এতদিনে মুখ তুইলা চাইলেন।

চাইলেন মানে? চেয়ে বসে আছেন। শুধু বারঠাকুর কেন মায় তেত্রিশ কোটি দেবতা এখন আপনার ওপর সুপ্রসন্ন। চাইলে অনন্তবাবুর গর্দান আপনি নিতে পারেন এখন।

না না, গর্দান আমি অর নিবার চাই না। তবে বড় ফুটানি বাড়চিল ব্যাটার। কোচানো ধুতি পাঞ্জাবি পইরা দুই বেলা ব্যাটা আমার নাকের ডগা দিয়া আসা যাওয়া করে। এত অহঙ্কার যে, আমার দিগে একবার ফিরাও চায় না! ইবার দেখুম, কোথায় থাকে ফুটানি।

আবার কোথায়? এখন উনি আপনার পা চেটে কূল পাবেন না। উঠি, উনি আবার আপনার দোকানে আমাকে দেখলে তলায় তলায় কলকাটি নাড়তে পারেন। ওনার স্বভাব-চরিত্র তো আপনি জানেনই।—উঠে দাঁড়ায় মহেন্দ্র।

ইন্দ্রমোহন বাধা দেন, একটু খাড়ন। যদি কিচু মনে না করেন, বড়-বাবুর লেইগা তুইডা খাজের দিবার চাই। দয়া কইরা যদি লইয়া যান!

আলবৎ দেবেন। তু'দিন বাদে আপনি বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হচ্ছেন। আপনার এই সামান্য আদেশটুকু আমি শুনবো না? —বিস্ময়ের সঙ্গেই জবাব দেয় মহেন্দ্র।

ইন্দ্রমোহনের কানে হয়তো অত কথা ঢোকে না। ঝাঁ ক'রে এক ঠোঙা খেজুর তুলে মহেন্দ্রর হাতে দেন।

মহেন্দ্র মিটমিট ক'রে হাসতে হাসতেই খেজুরের ঠোঙা নিয়ে সরে পড়ে।

সুযোগ পেয়ে তাহের আলি আবার অনুরোধ জানায়, অ কত্তা, দ্যাও না আমারে ব্যাদানাটা মাইপা? ঘরে রোগা পোলা রইচে, নাও ছাইড়া গেলে মশকিলে পরুম নে।

কি প্যানর প্যানর করবার নইচ মিঞা। নিয়া যাও তোমার ব্যাদানা। মাপন-মোপন এখন যাইব না। দামও তোমারে দেওয়ন লাগব না। যাও, পোলারে গিয়া খাওয়াও গা, বলতে বলতে একটার বদলে তুটো বেদানা তাহেরের হাতে গুঁজে দেন। এতো তুচ্ছ তুটো বেদানা। চাইলে দোকানের সর্বস্ব আজ উনি বিলিয়ে দিতে পারেন। প্রেসিডেণ্ট—গঞ্জের প্রেসিডেণ্ট আজ উনি। অনন্তদেবের ফুটোনি করা চলবে না। কি মজা, প্রেসিডেণ্ট—প্রেসিডেণ্ট…

ঝিমিয়ে পড়েছিলেন ইন্দ্রমোহন, মহেন্দ্রর সংবাদে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। শনিবারের হাট। ভরা তুপুর। বেচা-কেনার এই উপযুক্ত সময় কিন্তু। ইন্দ্রমোহন ও নিয়ে ভাবেন না। বেদানা তুটো তাহেরের হাতে গুঁজে দিয়ে দোকান বন্ধ করতে থাকেন। না না, আর সময়ক্ষেপ নয়। এক্ষুনি বারঠাকুরের আসনে গিয়ে পূজো দিতে হবে। তার পর বাড়ির লোককে গিয়ে জানাতে হবে। বুচির মা তো কথায় কথায় খোঁটা দেয়। এবার দেখুক, সত্যি প্রেসিডেণ্ট হলেম কি না। —ইন্দ্রমোহন আর দাঁড়ান না। এক লহমায় দোকান বন্ধ ক'রে বাড়ির দিকে ছোটেন।

তাহের কোন কথাই বলতে পারে না। বেদানা দুটো হাতে নিয়ে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, কর্তার হলো কি! যে মানুষ অন্যদিন একটা ফুটো পয়সা ছাড়ে না সেই আজ অমনি দুটো বেদানা দিয়ে দিলে! যাক, অনেক পয়সা খাইয়েছি ওকে। দাম না নেয় না নিক, তাহেরও নির্ভাবনায় নিজের নৌকোর খোঁজে ছোটে।

খুশীর হাওয়াই বয়ে চলে ইন্দ্রমোহনের চোখে-মুখে। প্রতিদিন উদ্বেগ আকুল চোখে টেলিগ্রাম পিয়নের পথ চেয়ে বসে থাকেন। কিন্তু না, এক মাসের জায়গায় দু'মাস হতে চললো, পিয়নের পাত্তা নেই। মহেন্দ্র অবশ্য প্রতি হাটেই এসে তাতিয়ে যাচ্ছে। পান বিড়ি সিগারেটও নিয়মিতই মারছে। কিন্তু ইন্দ্রমোহনের মনে শান্তি নেই। তবে কি অনন্তদেবই তলায় তলায় শিকড় কাটলো?···

পরের শনিবারের হাট। পৌষ-পার্বণ উপলক্ষে বাজার আজ সরগরম। নানা উপচারে ইন্দ্রমোহনের দোকান সুসজ্জিত। বেচাকেনা জোর লেগেছে। একা সামলে উঠতে পারছে না। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হয় দুখাই চৌকিদার। হাতে খামে মোড়া টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রাম! কই দেখি, ছোঁ মেরে দুখাই'র হাত থেকে খামখানা কেড়ে নেন ইন্দ্রমোহন। ঝাঁ ক'রে মোড়ক ছিঁড়ে ফেলেন। দূর ছাই, এযে ইংরেজীতে লেখা! মহা ফাঁপরে পড়েন ইন্দ্রমোহন। ইতিউতি তাকাতে যান। আরে, ঐ ত রমণী মাস্টার ওখানে কলা কিনছেন! —ছুটে গিয়ে রমণী মাস্টারকে টেনে নিয়ে আসেন।

রমণী মাস্টার গম্ভীরভাবেই পড়ে যায়, 'অনন্তদেব রায় চৌধুরী ইজ ডিস্‌মিস্‌ড এ্যাণ্ড ইউ আর হিয়ারবাই এ্যাপয়েণ্টেড এ্যাজ দি প্রেসিডেণ্ট অব দি ইউনিয়ন অব্ গঞ্জ—এস, পি, সদয়।'

পাঠ শেষ ক'রে রমণী মাস্টার নিজের কাজে এগিয়ে যাচ্ছিল, ইন্দ্রমোহন ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরেন, তোমার আক্কল কি মাস্টার! শুভ সংবাদের পর খালি মুখে ফিরা যাও! আস, দুইখান কদমা খাইয়া যাও।...

শুধু দু'খানি কদমা প্রেসিডেণ্ট সাহেব!—রমণী মাস্টার হেসে ফেলেন।

আরে ঘাবড়াও ক্যান মাস্টার! আগে গদিতে বইসা নেই, তোমাগ প্যাট ভইরাই রসগোল্লা পানতুয়া খাওয়ামু। কিন্তু মাস্টার, টেলিগ্রামের মধ্যে পোস্টাপিসের ছাপ নাই ক্যান কও ত?

উত্তর আর রমণী মাস্টারকে দিতে হয় না দুখাই এগিয়ে এসে উচ্ছ্বাস জানায়, আপনে কন কি স্যার! আপনের নামে শুভ সংবাদ, কতক্ষণে অরা ছাপ দিব না দিব হ্যার লেইগা আমি দেরি করুম! হোসেন আলীর হাতের থেইকা আমি টাইনা লইয়া দৌড়াইচি না! হ্যান এলা আমার বকশিশটা।

নিশ্চয় নিশ্চয় বকশিশ ত তুই পাবিই। খা, আগে মিষ্টি মুখ কর, —বলতে বলতে দুখাই'র হাতেও দু'খানা কদমা গুঁজে দেন।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে যায়। হাটের লোক এসে জড়ো হয়, ইন্দ্রমোহন দু'হাতে তিলা কদমা, পাটালি গুড়, কমলালেবু বিলোতে থাকেন।

সকলের সঙ্গে এক ফাঁকে অনন্তদেবও এসে দাঁড়ায়। ইন্দ্রমোহনের কাণ্ড দেখে ফিক ক'রে হেসে ফেলে। হাসতে হাসতেই মন্তব্য করে, 'কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ।'

কিন্তু ইন্দ্রমোহন সে কথায় কান দেন না। উল্লাসে দু'টো কদমা তার দিকেও ছুঁড়ে দেন।